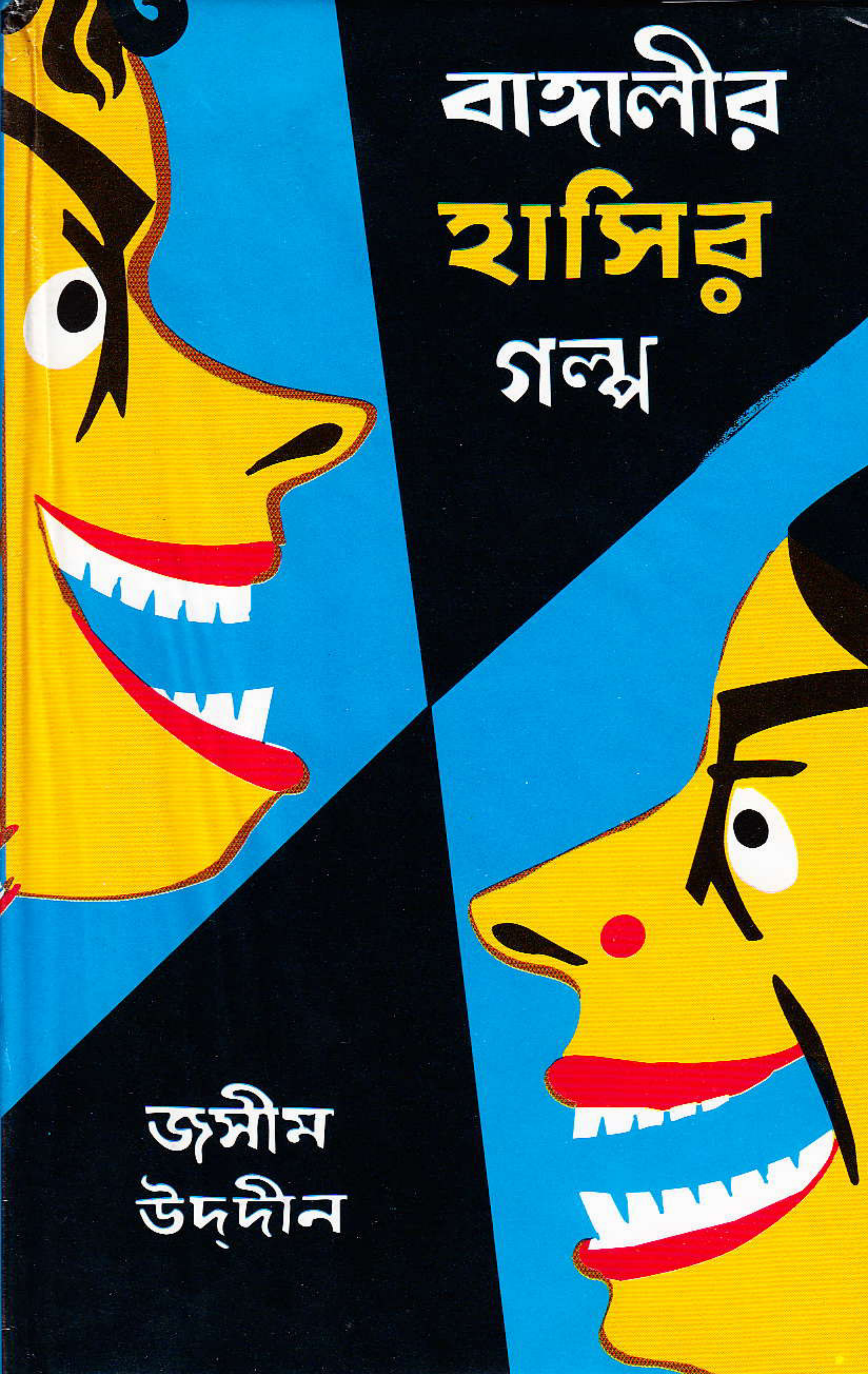
বাঙালীর
হাসির
গল্প
জসীম
উদ্‌দীন

বাঙালীর হাসির গল্প

[প্রথম খণ্ড]

জসীম উদ্‌দীন (পল্লীকবি)

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
67234
স্থাপিত-১৯৭৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

পলাশ প্রকাশনী

BANGLIR HASIR GALAPA
By
Jasim Uddin

বাঙ্গলীর হাসির গল্প-১
কবি জসীম উদ্‌দীন

প্রকাশক
খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন
পলাশ প্রকাশনী
১০ কবি জসীম উদ্‌দীন রোড
ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : মোঃ ইদ্রিস
অলঙ্করণ : মোস্তফা মনোয়ার

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০
প্রকাশ : এপ্রিল ২০১১

প্রথম প্রকাশ ১-৮-১৯৬৪
তৃদশ প্রকাশ ১৫ই এপ্রিল, ২০১১

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স

মূল্য
❑ অফসেট (৭০ GSM) ১৬০.০০ টাকা

পলাশ প্রকাশনীর যে কোনো বই প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত পুনর্মুদ্রণ, পুনঃপ্রকাশ, চলচ্চিত্রায়ণ বা রূপান্তরকরণ সম্পূণ নিষিদ্ধ গ্রনস্থস্বত্ব আইন নিবনন্ধন নং-৪১৬৩-কপার ২২শে এপ্রিল ১৯৯২ ইং।

খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন
পলাশ প্রকাশনী
১০ কবি জসীম উদ্‌দীন রোড, ঢাকা-১২১৭
Mobile : 01711946026
ISBN : 984-460-036-9

এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ ইংরেজি অনুবাদ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কষ্টকর, বিশেষ করে ২০ বছর পর দেশে ফিরে এসে সেটাই প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করেছি। কাগজের দুর্মূল্য সুস্থ প্রকাশনা-কর্মকে ব্যাহত করছে। একদিকে প্রকাশনাকে যেমন শিল্প হিসেবে ঘোষণা না করায় বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটছে না, অন্যদিকে তেমনি কাগজের অযথা অপচয় যথাযথ প্রকাশনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অবাক করার মতো হলেও সত্য যে, এদেশের রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক প্রায় সব পোস্টারেই বই–এর কাগজ ব্যবহার করা হয় যা প্রকাশনার জন্যে বরাবর হুমকি বা অভিশাপ ডেকে আনছে। ব্যক্তি বা দলীয় প্রচারণার ক্ষেত্রে নিউজপ্রিণ্ট এবং রেডিও-টিভির ওপর নির্ভরশীল হলে কাগজসংকট অনেকটা মোচন হবে এবং ক্রয়মূল্য স্থিতিশীল থাকবে বলে আমি মনে করি।

বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ১৯৭৪ সালে কবি জসীম উদ্‌দীন-এর প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

"আমার কথাগুলি শেষ হইবার আগে পূর্বের কথাগুলি আরেকবার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই।

১. কাগজের উপর হইতে আবগারী কর মওকুফ করিয়া কাগজকে সহজলভ্য করিতে হইবে।

২. পশ্চিমবঙ্গ হইতে বইপুস্তক আনিবার আগে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করিতে হইবে তাহারাও যেন এখান হইতে সমমূল্যের বইপুস্তক ক্রয় করেন।

৩. বইপুস্তকের বিজ্ঞাপনের হার শতকরা ৭৫ ভাগ কমাইতে হইবে।

৪. দেশে অসংখ্য মুদ্রণযন্ত্র আনিবার জন্য উপযুক্ত বিদেশী মুদ্রা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

৫. রেডিও টেলিভিশন হইতে বিকৃত রুচির অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করিতে হইবে।

৬. সাহিত্যের উপর পুরস্কার দিতে কোনো দলবিশেষের প্রভাব বাতিল করিতে হইবে। কিছু লেখক, কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু শিক্ষা বিভাগের সভ্য লইয়া কমিটি গঠন করিয়া পুরস্কারের যোগ্য সাহিত্যিক নির্বাচন করিতে হইবে।

৭. আয়কর হইতে সাহিত্যিকদিগকে মুক্ত করিতে হইবে। যদিও এদেশের সাহিত্যিকগণ বইপুস্তক হইতে বিশেষ কিছু আয় করেন না তবু আয়করের দরবারে হিসাবপত্র দাখিল করিতে লেখকদের পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা। হিসাবপত্র

রাখিতে অপটু লেখকরা আয়করের আওতার বাহিরে থাকিয়া যাহাতে নিজ নিজ রচনাকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। ইতিপূর্বে সরকার এ ব্যাপারে সামান্য কিছু করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখকদের বিশেষ কোনো উপকার হয় নাই।

৮. লেখকদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের পরিবার পরিজন কপর্দকহীন নিঃস্ব হইয়া পড়ে। সেইজন্য লেখকদের লইয়া সরকার একটি জীবন বীমা গঠন করিবেন। মৃত্যুর পরে লেখকদের পরিবার সেখান হইতে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ভাতা পাইবেন। বঙ্গবন্ধুর গঠিত লেখক ট্রাস্ট হইতে এরূপ জীবন বীমার খরচ চালানো যাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, ইতিপূর্বে সরকারের সব বিভাগে যৌথ জীবন বীমার ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

৯. এদেশে কোনো রঙ্গমঞ্চ নাই। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলিয়া মাঝে মাঝে যে নাটক মঞ্চস্থ করে তাহাতে টিকেটের বন্দোবস্ত হইলে আবগারী বিভাগ প্রমোদকর আদায় করিতে আসেন। গ্রামদেশে যাত্রা লোকসঙ্গীত প্রভৃতির অনুষ্ঠানে যদি টিকেটের ব্যবস্থা করা হয় তাহাতেও প্রমোদকর দিতে হয়। আমাদের প্রস্তাব সিনেমা হলগুলি বাদে দেশের অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সরকার যেন কোনো প্রমোদকর আদায় না করেন।"

জসীম উদ্‌দীন,

— মূল সভাপতি, বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ১৯৭৪, উদ্বোধনী দিবসের ভাষণ

কবির সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত ও বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দুর্লভ লেখাসমূহ সংগ্রহ করে তা মলাটবন্দী করার কাজটিই বেশি হয়েছে। এ ছাড়া নিঃশেষিত গ্রন্থসমূহ পুনঃপ্রকাশ হচ্ছে যেমন বাঙালির হাসির গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড। ইতিপূর্বে 'আসমান সিংহ' ও 'আসমানীর কবিভাই' এবং 'বউ টুবানীর ফুল' প্রকাশ করে পল্লীকবির অসংখ্য পাঠক ও গুণগ্রাহীর নিকট থেকে যারপরনাই সাড়া ও ধন্যবাদ পেয়েছি। অবশ্য সকল অনুপ্রেরণার উৎস সহৃদয় পাঠকবৃন্দ, যাঁদের জন্যই এই আয়োজন, নিরন্তর সামনের দিকে এগিয়ে চলা।

খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন
পলাশ বাড়ি
১০ কবি জসীমউদ্‌দীন সড়ক ঢাকা– ১০০০
২৬শে মার্চ ১৯৯০

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কষ্টকর, বিশেষ করে ২০ বছর পর দেশে ফিরে এসে সেটাই প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করেছি। কাগজের দুর্মূল্য সুস্থ প্রকাশনা-কর্মকে ব্যাহত করছে। একদিকে প্রকাশনাকে যেমন শিল্প হিসেবে ঘোষণা না করায় বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটছে না, অন্যদিকে তেমনি কাগজের অযথা অপচয় যথাযথ প্রকাশনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অবাক করার মতো হলেও সত্য যে, এদেশের রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক প্রায় সব পোস্টারেই বই–এর কাগজ ব্যবহার করা হয় যা প্রকাশনার জন্যে বরাবর হুমকি বা অভিশাপ ডেকে আনছে। ব্যক্তি বা দলীয় প্রচারণার ক্ষেত্রে নিউজপ্রিন্ট এবং রেডিও-টিভির ওপর নির্ভরশীল হলে কাগজসংকট অনেকটা মোচন হবে এবং ক্রয়মূল্য স্থিতিশীল থাকবে বলে আমি মনে করি।

বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ১৯৭৪ সালে কবি জসীম উদ্‌দীন-এর প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

"আমার কথাগুলি শেষ হইবার আগে পূর্বের কথাগুলি আরেকবার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই।

১. কাগজের উপর হইতে আবগারী কর মওকুফ করিয়া কাগজকে সহজলভ্য করিতে হইবে।

২. পশ্চিমবঙ্গ হইতে বইপুস্তক আনিবার আগে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করিতে হইবে তাহারাও যেন এখান হইতে সমমূল্যের বইপুস্তক ক্রয় করেন।

৩. বইপুস্তকের বিজ্ঞাপনের হার শতকরা ৭৫ ভাগ কমাইতে হইবে।

৪. দেশে অসংখ্য মুদ্রণযন্ত্র আনিবার জন্য উপযুক্ত বিদেশী মুদ্রা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

৫. রেডিও টেলিভিশন হইতে বিকৃত রুচির অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করিতে হইবে।

৬. সাহিত্যের উপর পুরস্কার দিতে কোনো দলবিশেষের প্রভাব বাতিল করিতে হইবে। কিছু লেখক, কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু শিক্ষা বিভাগের সভ্য লইয়া কমিটি গঠন করিয়া পুরস্কারের যোগ্য সাহিত্যিক নির্বাচন করিতে হইবে।

৭. আয়কর হইতে সাহিত্যিকদিগকে মুক্ত করিতে হইবে। যদিও এদেশের সাহিত্যিকগণ বইপুস্তক হইতে বিশেষ কিছু আয় করেন না তবু আয়করের দরবারে হিসাবপত্র দাখিল করিতে লেখকদের পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা। হিসাবপত্র

উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক
বন্ধুবর কুদরতউল্লা সাহাবের
দরাজদস্তে

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন

উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক
বন্ধুবর কুদরতউল্লা সাহাবের
দরাজদস্তে

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সূচিপত্র

১।	গোপ্যার বউ	১
২।	আয়না	৫
৩।	নাপিত– ব্রাহ্মণ	৯
৪।	নাপিত-ডাক্তার	২১
৫।	জিদ	২৬
৬।	কে বড়	৩২
৭।	পরের ধনে পোদ্দারি	৪০
৮।	টুনটুনি আর টুনটুনা	৪৪
৯।	টুনটুনির বুদ্ধি	৫৪
১০।	জামায়ের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা	৫৯
১১।	চুক্তি	৬৪
১২।	গুরুঠাকুরের ভাগবত পাঠ	৬৮
১৩।	সত্যকার আলসে	৮১
১৪।	ঠেলাঠেলির ঘর	৮৩
১৫।	দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত	৮৫
১৬।	তিন মুসাফির	৯০
১৭।	বোকার বাণিজ্য	৯৩
১৮।	তুমভি কাঁঠাল খায়া	৯৪
১৯।	সেরটা কত বড়	৯৭
২০।	সমানে সমান	১০৩
২১।	ভাগাভাগি	১১১
২২।	ঠাকুরমশায়ের লাঠি	১১৬
২৩।	মাঝি ও পণ্ডিত	১২৪
২৪।	আমের স্বাদ	১২৭
২৫।	অনুমতিপত্র কে দেখাইবে ?	১৩০
২৬।	শ্বশুর জামাই	১৩৬
২৭।	অচ্ছুৎ	১৩৯

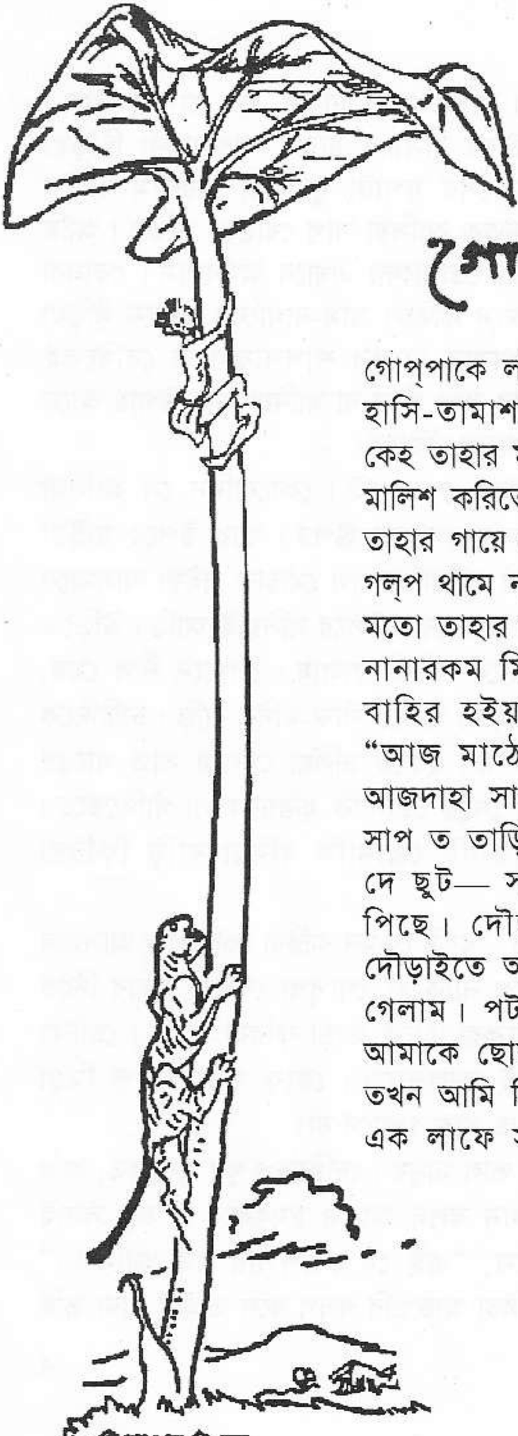

গোপ্যার বউ

গোপ্‌পাকে লইয়া পাড়ার লোকের হাসি-তামাশার আর শেষ নাই। কেহ তাহার মাথায় কেরাসিন তৈল মালিশ করিতে ছুটিয়া আসে, কেহ তাহার গায়ে ধূলি দেয়। তবু তার গল্‌প থামে না। জোয়ারের পানির মতো তাহার মুখ হইতে সব সময় নানারকম মিছা আজগুবি গল্‌প বাহির হইয়া আসিতে থাকে। “আজ মাঠে যাইয়া দেখি এক আজদাহা সাপ! আমাকে দেখিয়া সাপ ত তাড়িয়া আসিল। আমিও দে ছুট— সাপও আমার পিছে পিছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম। পট-ফণা মেলিয়া সাপ আমাকে ছোবল দেয়ই আর কি! তখন আমি কি করি ? তাড়াতাড়ি এক লাফে সাপের ফণার উপর চড়িয়া বসিলাম। সাপ তখন ছুটিয়া চলিল। আমি ত ফণার উপর

বসিয়াই আছি। ছুটিয়া যাইয়া সাপ ঢুকিল এক শাপলা-বিলে। আমি সাপের ফণার উপর বসিয়াই চারটি শাপলাফুল ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। তারপর সাপের ফণাটা ঘুরাইয়া ধরিলাম বাড়ির দিকে। ওই আম-বাগানতক আসিয়া সাপ খোড়লে ঢুকিল। আমি শাপলাফুল কয়টি লইয়া তোমাদের এখানে আসিলাম। তোমরা সাপের কথা সাঁচা না মনে করিলে আম-বাগানের ওখানে খুঁড়িয়া 'দেখিতে পার, আর আমার হাতের শাপলাফুল ত দেখিতেই পাইতেছ।" সুতরাং তার কথা সাঁচা না মানিয়া আর উপায় আছে ? কে যাইবে সাপের খোড়ল খুঁজিতে!

এইরূপ গল্পের আর শেষ নাই। কোনোদিন সে আসিয়া বলে, "মৌমাছির চাক কুলগাছের উপর। তার উপরে যাইয়া বসিয়া পড়িলাম। অমনি মৌমাছির দল মৌচাক লইয়া আসমানে উড়িতে লাগিল। আমি ত চাকের উপরে বসিয়াই আছি। উড়িতে উড়িতে উড়িতে আসমানে চলিয়া গেলাম। সেখানে নীল মেঘ, কালো মেঘের দেশ। তারও উপরে সাঁঝ-মণির বাড়ি। চারিদিকে সিন্দুরের পাহাড়। সেখান হইতে চলিয়া গেলাম সাত গাঙের ধারে। সেখানে রাজার মেয়ে জোনাকি ধরিয়া মালা গাঁথিতেছে। তারই কাছ হইতে তিনটি জোনাকি ধরিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।"

শুনিয়া সকলে বলে, "বাড়ি কেমন করিয়া ফিরিলে ? আসমান হইতে লাফাইয়া পড়িলে নাকি ?" গোপ্পা কোনো জবাব দিতে পারে না। পাড়ার লোকেরা তাকে তাড়া করিয়া ফেরে। ছোটরা তবু গোপ্পাকে বড়ই ভালবাসে। হোক তার গল্প মিছা আজগুবি, তবু শুনিতে ত খারাপ লাগে না!

গোপ্পার বউ বড় ভাল মানুষ। দেখিতেও খুব খুবছুরত, আর তার কথা-কওয়া, চলন বলন আরও চমৎকার ; তবু সবাই তাহাকে দেখিলে বলে, "এই যে গোপ্পার বউ আসিল।" গোপ্পা যেখানে যত মিছা আজগুবি গল্প বলে তাহাই নানা ভঙ্গি

করিয়া লোকে গোপ্পার বউকে বলে ; আর নানা রকমের হাসি-তামাশা করে।

বেচারি কত আর সয় ? সেদিন গোপ্পা বউকে খুশি করিবার আশায় মনে মনে একটি চমৎকার আজগুবি গল্প বানাইয়া আনিয়াছিল, বাড়ি আসিয়া বউ-এর মুখের দিকে চাহিয়া বড়ই মনমরা হইয়া পড়িল। সে কহিল, "কি হইয়াছে বল ত ?"

বউ ঠেস দিয়া উঠিয়া বলিল, "কি হইয়াছে বুঝিতে পার না ? এই যে পাড়ায় পাড়ায় মিছা আজগুবি গল্প বানাইয়া বানাইয়া বলিয়া বেড়াও, লোকের টিট্কারিতে ত আমি ঝালাপালা হইয়া পড়িলাম। আমাকে যে দেখে সে-ই বলে, ওই যে গোপ্পার বউ আসিল।"

বউয়ের দুখ্খ দেখিয়া গোপ্পার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল। সে বউকে কহিল, "বল ত আমাকে কি করিতে হইবে?"

বউ বলিল, "করিতে আর কি হইবে ? তুমি তোমার ওই গল্পের ছালা কোথাও ফেলিয়া দিয়া আস।"

অনেকক্ষণ ভাবিয়া গোপ্পা বলিল, "কাল সকালে আমি সামনের ওই পাহাড়টার ওখানে যাইয়া গল্পের ছালা ফেলিয়া দিয়া আসিব। সেখানে অনেক বাঘ-ভালুক থাকে, বড়ই বিপদের পথ। আর ফিরি কি না ফিরি কে জানে ? তবু যাব সেখানে কাল।"

বউ বলিল, "তুমি ফের বা না ফের তার ধার ধারি না। গল্পের ছালা তোমাকে ফেলিয়া আসিতেই হইবে।"

রাগের মাথায় একথা বলিলে কি হইবে ? সাঁচা ত মনে হয় না, তবু যদি সেখানে বাঘ-ভালুকের ভয় থাকে! বউ সকালে উঠিয়া ভালমতো পাক করিয়া দুধে-ভাতে গোপ্পাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিল। খাইয়া-দাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গোপ্পা গল্পের বোঝা ফেলিয়া আসিতে দূর পাহাড়ের পথে রওয়ানা হইল। পথে যাইতে এমন ভঙ্গি দেখাইয়া চলিল যেন কত বড় বোঝাটা সে মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

সাঁঝের বেলা গোপ্‌পা ফিরিয়া আসিল। বউ কহিল "গল্‌পের ছালা একেবারে উজাড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছ ত ?"

গোপ্‌পা বলিল, "ফেলিতে কি পারিলাম ? আমি ত ওই পাহাড়ের কাছে গিয়াছি, অমনি এক বাঘ আসিয়া দিল আমাকে তাড়া। আমিও দৌড়! বাঘও আমার পাছে পাছে দৌড়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পাহাড়ের গোড়ায় যাইয়া পড়িলাম।

সামনে আর পথ নাই। বাঘ ত একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। জানের ভয়ে কি আর করি ? সামনে দেখিরাম একটি কচুগাছ। তার ডাল ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। বাঘও আমার পিছে পিছে উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে আরও উঠিলাম— আরও উঠিলাম। বাঘও উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিতেছি— বাঘও উঠিতেছে, আমিও উঠিতেছি— বাঘও উঠিতেছে। তারপর আমাদের দুইজনের ভারে কচুগাছের ডাল গেল ভাঙিয়া। পড়ি ত পড়ি একেবারে তোমার ভাইদের বাড়ির সামনে যাইয়া পড়িলাম। তোমার ভাই-এর বউ আজ মুরগি পাক করিয়াছিল, আর চিতই পিঠা। তাই খাইয়া বাড়ি ফিরিলাম!"

গল্‌প শুনিয়া গোপ্‌পার বউ হাসি গোপন করিয়া বলিল "ওমা! তোমাকে পাঠাইলাম গল্‌পের ছালা ফেলিয়া দিয়া আসিতে, আর তুমি কিনা, আর এক ছালা গল্‌প মাথায় করিয়া বাড়ি ঢুকিলে !"

আয়না

এক চাষী খেতে ধান কাটিতে কাটিতে একখানা আয়না কুড়াইয়া পাইল। তখন এদেশে আয়নার চলন হয় নাই। কাহারও বাড়িতে একখানা আয়না কেহ দেখে নাই। এক কাবুলিওলার ঝুলি হইতে কি করিয়া আয়নাখানা মাঠের মাঝে পড়িয়া গিয়াছিল। আয়নাখানা পাইয়া চাষী হাতে লইল। হঠাৎ তাহার উপরে নজর দিতেই দেখে, আয়নার ভিতর মানুষ! আহা-হা, এযে তাহার বাপজানের চেহারা!

বহুদিন তার বাপ মারা গিয়াছে। আজ বড় হইয়া চাষীর নিজের চেহারাই তার বাপের মতো হইয়াছে। সব ছেলেই বড় হইয়া কতকটা বাপের মতো চেহারা পায়। তাই আয়নায় তাহার নিজের চেহারা দেখিয়াই চাষী ভাবিল, সে তাহার বাবাকে দেখিতেছে। তখন আয়নাখানাকে কপালে তুলিয়া সে সালাম করিল। —মুখে লইয়া চুমো দিল। "আহা বাপজান! তুমি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া আমার ধান-খেতের মধ্যে লুকাইয়া আছ! বাজান—বাজান!— ও বাজান!"

চাষী এইভাবে কথা কয় আর আয়নার দিকে চায়। আয়নার ভিতর তাহার বাপজান কতই ভঙ্গি করিয়া চায়।

চাষী বলে, "বাজান! তুমি ত মরিয়া গেলে। তোমার খেত ভরিয়া আমি সোনাদিঘা ধান বুনিয়াছি, শাইল ধান বুনিয়াছি। দেখ দেখ বাজান! কেমন তারা রোদে ঝলমল করিতেছে। তোমার মরার পর বাড়িতে মাত্র একখানা ঘর ছিল। আমি তিনখানা ঘর তৈরি করিয়াছি। বাজান!— আমার সোনার বাজান! আমার মানিক বাজান!"

সেদিন চাষী আর কোনো কাজই করিল না। আয়নাখানা হাতে লইয়া তার সবগুলি খেতে ঘুরিয়া বেড়াইল। সাঁঝ হইলে বাড়ি আসিয়া আয়নাখানাকে কোথায় রাখে ! সে গরিব মানুষ। তাহার বাড়িতে ত কোনো বাক্‌স নাই! সে পানির কলসির ভিতর আয়নাখানাকে লুকাইয়া রাখিল।

পরদিন চাষী এ কাজ করে, ও কাজ করে, দৌড়াইয়া বাড়ি আসে। এখানে যায়, সেখানে যায়, আর দৌড়াইয়া বাড়ি আসে। পানির কলসির ভিতর হইতে সেই আয়নাখানা বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, আর কত রকমের কথা বলে! "বাজান!— আমার বাজান!— তোমাকে একলা রাখিয়া আমি এ কাজে যাই—ও কাজে যাই, তুমি রাগ করিও না। দেখ বাজান! যদি আমি ভালমতো কাজ-কাম না করি তবে আমরা খাইব কি ?"

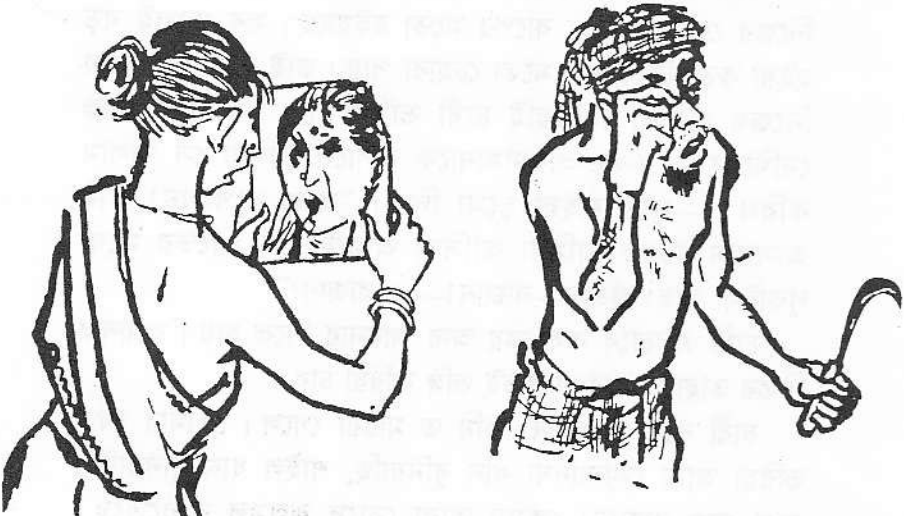

চাষার বউ ভাবে, "দেখরে। এতদিন আমার সোয়ামি আমার সাথে কত কথা বলিত, কত হাসি-তামাশা করিয়া এটা-ওটা

চাহিত, কিন্তু আজ কয়দিন আমার সাথে একটাও কথা বলে না। পানির কলসি হইতে কি যেন বাহির করিয়া দেখে, আর আবল-তাবল বকে, ইহার কারণ কি?"

সেদিন চাষী খেতখামারের কাজে মাঠে গিয়াছে। চাষীর বউ গোপনে গোপনে পানির কলসি হইতে সেই আয়নাখানা বাহির করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিল। আয়নার উপর তার নিজেরই ছায়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু সে ত কোনোদিন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নাই। সে মনে করিল, তার সোয়ামি আর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিয়া এই পানির কলসির ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য আজ কয়দিন তার স্বামী তার সাথে কোনোই কথা বলিতেছে না। যখনই অবসর পায় ওই মেয়েটির সাথে কথা বলে।

"আসুক আগে মিন্‌সে বাড়ি। আজ দেখাইব এর মজা!" একটি ঝাঁটা হাতে লইয়া বউ রাগে ফুলিতে লাগিল ; আর যে যে কড়া কথা সোয়ামিকে শুনাইবে, মনে মনে আওড়াইয়া তাহাতে শান দিতে লাগিল।

দুপুরবেলা মাঠের কাজে হয়রান হইয়া, রোদে ঘামিয়া, চাষী যখন ঘরে ফিরিল ; চাষার বউ ঝাঁটা হাতে লইয়া তাড়িয়া আসিল, "ওরে গোলাম, তোর এই কাজ ? একটা কাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিস ?" এই বলিয়া আয়নাখানা চাষীর সামনে ছুড়িয়া মারিল।

"কর কি ?—কর কি ?— ও যে আমার বাজান!" অতি আদরের সাথে সে আয়নাখানা কুড়াইয়া লইল।

"দেখাই আগে তোর বাজান !" এই বলিয়া ঝটকা দিয়া আয়নাখানা টানিয়া লইয়া বলিল, "দেখ্ ত মিন্‌সে! এর ভিতর কোন মেয়েলোক বসিয়া আছে ? এ তোর নতুন বউ কি না ?"

চাষী বলে, "তুমি কি পাগল হইলে ? এ যে আমার বাজান!"

"ওরে গোলাম! ওরে নফর! তবু বলিস তোর বাজান! তোর বাজানের কি গলায় হাসলি, নাকে নথ আর কপালে টিপ আছে নাকি ?" বউ আরও জোরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

ও বাড়ির বড় বউ বেড়াইতে আসিয়াছিল। মাথায় আধঘোমটা দিয়া বলিল, "কিলো, তোদের বাড়ি এত ঝগড়া কিসের ? তোদের ত কত মিল। একদিনও কোনো কথা কাটাকাটি শুনি নাই।"

চাষীর বউ আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"দেখ বুবুজান! আমাদের মিন্‌সে আর একটি বউ বিবাহ করিয়া আনিয়া পানির কলসির ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ওই সতীনের মেয়ে সতীনকে আমি পা দিয়া পিষিয়া ফেলিব না ? দেখ দেখ, বুবুজান! এই আয়নার ভিতর কে ?"

ও বাড়ির বড় বউ আসিয়া সেই আয়নার উপরে মুখ দিল! তখন দেখা গেল আয়নার ভিতরে দুইজনের মুখ। ও বাড়ির বড় বউ বলিল, "এ ত তোর চেহারা। আর একজন কার চেহারাও যেন দেখিতে পাইতেছি।"

চাষী বলিল, "কি বলেন বুবুজান, এর ভিতর আমার বাপজানের চেহারা।"

এই বলিয়া চাষী আসিয়া আয়নার উপরে মুখ দিল। তখন তিনজনের চেহারাই দেখা গেল। তাহাদের কলরব শুনিয়া ও বাড়ির ছোট বউ, সে বাড়ির মেজো বউ আসিল, আরফানের মা, রহমানের বোন, আনোয়ারার নানী আসিল। যে আয়নার উপরে মুখ দেয়, তাহারি চোহারা আয়নায় দেখা যায়— এ ত বড় তেলেছমাতির কথা!

শেনাশোন এই কথা এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে রটিয়া গেল। এদেশ হইতে ওদেশ হইতে লোক ছুটিয়া আসিল সেই যাদুর তেলেছমাতি দেখিতে। তারপর ধীরে ধীরে লোকে বুঝিতে পারিল, সেটা আয়না।

নাপিত-ব্রাহ্মণ

কথায় বলে, নাপিতের ষোল চুঙা বুদ্ধি! নাপিত বাদশা-উজির হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, গায়ক, কবি, সওদাগর বহু রকমের লোককে খেউড়ি করে। খেউড়ি করিবার সময় সে তাহাদের নিকট বহু রকমের কথা শোনে, বহু রকমের কেচ্ছা-কাহিনী শোনে। তাই সাধারণ লোকের চাইতে নাপিতের বুদ্ধি বেশি। হইলে কি হইবে ? সবাই নাপিতকে অবহেলা করে। কিন্তু তাহার কাজটা এমনই বা খারাপ কিসে? সে না থাকিলে দাড়ির জঙ্গলে সকলের মুখ ঢাকা থাকিত। কেউ কাহাকেও চিনিতে পারিত না। হাতের পায়ের নখ বড় হইয়া মানুষ বনের বাঘ ভালুকের মতো হইত।

বামুন ঠাকুরের নাপিত চাকর। ঠাকুর মহাশয় শিষ্য বাড়িতে যায়— যজমান বাড়িতে যায়। এদেশে সেদেশে তার ঝুলি-কাঁথা মাথায় করিয়া নাপিতও সঙ্গে সঙ্গে যায়। তিন চার বৎসর এইভাবে চাকুরি করিয়া সে ঠাকুর মহাশয়ের পূজা-আর্চা, তন্ত্রমন্ত্র সবই শিখিয়া ফেলিল। কেহ কোনো অপরাধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের কি কি বিধান দিতে হইবে, কোন দিন কোন মাসে কি খাইতে হইবে, সকলই সে জানিয়া ফেলিল।

সে মনে মনে ভাবে, "দেখরে আমি কেন দেশে দেশে এই বামুন ঠাকুরের বোচকা-কাঁথা মাথায় করিয়া ঘুরি ? ইচ্ছা করিলে আমিই ত বিদেশে যাইয়া লোকের পূজা-আর্চা করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতে পারি। বিদেশে কে কাহাকে চেনে ? আমাকে চাকর বলিয়া সকলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। আর যখন জানিতে পারে, আমি জাতিতে নাপিত, তখন আমাকে লইয়া কত

ঠাট্টাই না করে। কিন্তু আমার বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধির জোরে আমি বিদেশে যাইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া সকল জাতির সম্মান পাইব।"

সত্য সত্যই একদিন সে মাথা হইতে ঠাস করিয়া মাথার বোঝাটা নামাইয়া ঠাকুর মহাশয়কে বলিল, "ঠাকুর মহাশয় ! আপনার চাকরি আমি আর করিব না! এই রহিল আপনার গাট্টিবোচকা, আমাকে বিদায় দিন।"

ঠাকুর মহাশয় ত আকাশ হইতে পড়িলেন : "কেনরে! তুই চাকরি করবি না কেন ?"

নাপিত বলিল, "আজ তিন চার বৎসর আপনার গাট্টিবোচকা মাথায় করিয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছি। আপনি মাসে আট টাকা মাত্র বেতন দেন। আমি এ চাকরি আর করিব না।"

কতদিনের বিশ্বাসী চাকর, কার ছাড়িতে প্রাণ চায়! ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা দেখ্, তোর বেতন নাহয় আরও দুই টাকা বাড়াইয়া দিব।"

"দুই টাকার আর কি লোভ দেখান ঠাকুর মশাই ? আপনি দেশে বিদেশে যেসব তন্ত্রমন্ত্র পড়িয়া পূজা-আর্চা করেন, আমি তার সবই শিখিয়া ফেলিয়াছি। আমি নিজেই এখন বামুন সাজিয়া দেশে দেশে গাঁওয়াল করিব! আপনার মতো আমিও বহু টাকা কামাই করিব! বিদেশে কে বামুন, কে নাপিত, কার কে খোঁজ রাখে !"

সত্য সত্যই নাপিত বামুনের চাকরি ছাড়িয়া, গলায় একটি পৈতা ঝুলাইয়া একখানা পুরান নামাবলী গায় দিয়া এদেশ হইতে আর এক দেশে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া সামনে দেখে মস্ত এক গৃহস্থবাড়ি। গৃহস্থ জাতিতে কায়স্থ। নাপিত ত জানেই কায়স্থদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে খুব ভক্তি।

তখন বেলা সন্ধ্যা হইয়াছে। বাড়ির সামনে যাইয়া, বামুনবেশী নাপিত বলিল, "দেখুন, আমি একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ। আজিকার মতো আপনাদের এখানে থাকিতে চাই।"

গৃহস্থ লোকটি বড় ভাল, আবার ব্রাহ্মণের উপর তার বড়ই ভক্তি। সে বলিল, "আপনি অনায়াসে আমার এখানে থাকুন। আপনি ত ব্রাহ্মণ। আমাদের রান্না খাইবেন না। আপনার রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

বামুনবেশী নাপিত তার বোচকা-বুচকি রাখিয়া-বাহির বাড়িতে রান্না করিতে আরম্ভ করিল। এই বিদেশী লোকটিকে রান্না করিতে দেখিয়া পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আসিয়া চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। এ বাড়ির বড় কর্তা, ও বাড়ির মেজো কর্তা, সে বাড়ির ন কর্তা আরও অনেকে আসিল। ঠাকুর মহাশয় রান্না করে আর গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে একথা সেকথা আলাপ করে।

তারপর বলে, "দেখুন, আপনাদের গ্রামে এতগুলি ছোট ছোট ছেলেপেলে, এদের জন্য একটা ভাল টোল নাই। লেখাপড়া না শিখিয়া ইহারা সকলে মূর্খ হইয়া থাকিবে।" গাঁয়ের প্রধান উত্তর করেন, "দেখুন, এই অজ পাড়াগাঁয়ে একজন ভাল বামুন পণ্ডিত নাই। এখানে কি করিয়া টোল খুলিব ?"

নাপিত একগাল হাসিয়া বলে, "আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আমি এখানে টোল খুলিয়া আপনাদের ছেলেপেলেদের লেখাপড়ার ভার লইতে পারি।" আগেকার দিনে স্কুলকে টোল বলিত।

গ্রামের মোড়ল যেন আসমানের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "বিলক্ষণ, আপনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি যদি ছোট ছেলেপেলেদের পড়ানোর ভার নেন, তবে কাল হইতে আমারই এখানে টোল খুলিতে পারি।"

গ্রামের লোকেরা অতি উৎসাহে সারা রাত জাগিয়া টোলের ঘর তৈরি করিল। পরদিন সকাল হইতে নাপিত ছেলেদের পড়াইতে আরম্ভ করিল। ছোট ছোট ছেলেপেলে। কি আর এমন কঠিন পড়া! ক, খ, র বইও পড়ে নাই। নাপিতের ত বর্ণ-পরিচয়

পড়াই ছিল। এদের পড়াইতে নাপিতের এতটুকুও বেগ পাইতে হইল না।

শোনাশোন নাপিতের প্রশংসা নানা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। এমন পণ্ডিত কোনো দেশেই দেখা যায় না! সাতশাস্ত্র তার মুখের মধ্যে পোরা!

দেশে নানারকমের আচার-পদ্ধতি, নিয়ম, কানুন, কুলাচার, লোকাচার, দেশাচার ; এগুলির পানটুকু হইতে চুনটুকু খসিবার উপায় নাই। কেউ যদি সেইসব নিয়মের এতটুকু ভঙ্গ করে, অমনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে ছুটিয়া যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করে, কি করিলে সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আর আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এরূপ অবস্থায় কত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া, বেদ-বেদান্ত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, কত অনুস্বর বিসর্গ শ্লোক আওড়াইয়া সামান্য অপরাধের জন্য বড় বড় প্রায়শ্চিত্তের ফর্দ দেন। তাহা পালন করিতে অপরাধীর জীবন-অন্ত। কিন্তু নাপিতবেশী পণ্ডিত অত বই পুথি ঘাঁটে না ; সে যাহা বিধান দেয় অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা সহজেই তাহা পালন করিতে পারে।

কেহ আসিয়া বলে, 'ঠাকুর মহাশয়! আজ আমি গঙ্গাস্নান না করিয়াই দুইটা সবরি কলা খাইয়া ফেলিয়াছি। আমার কি হইবে?"

নাপিত তৎক্ষণাৎ উত্তর করে, "আট হালি সবরি কলা আনিয়া এই ব্রাহ্মণকে উপহার দেও। তোমার কোনো অপরাধ হইবে না।"

আর একজন বলে, "আজ রাতে স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি রসগোল্লা খাইতেছি। ঘুমে খাওয়া ত অন্যায়! অমাকে কি করিতে হইবে ?"

নাপিত উত্তর করে, "বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না। সোয়া পাঁচ সের রসগোল্লা আমার কাছে আনিয়া দাও। আমি মন্ত্র পড়িয়া তোমার সকল অপরাধ খণ্ডন করাইয়া দিব।"

লোকটি খুশি হইয়া সোয়া পাঁচ সের রসগোল্লা লইয়া আসে। এইভাবে এটা ওটা ভেট পাইয়া নাপিতের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

সেই দেশে ছিল একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। তার দুইটি মেয়ে। বিবাহের বয়স হইয়াছে ; কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের বিবাহে বরকে অনেক টাকা দিতে হয়। মেয়ের বাপ গরিব বলিয়া এতদিনেও মেয়ে দুইটির বিবাহ দিতে পারেন নাই। সেদিন ব্রাহ্মণের স্ত্রী বলিতেছেন, "বলি ঠাকুর মশায়, তোমার চোখের কি মাথা খাইয়াছ ?"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ? কি হইয়াছে ?"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করেন, "ওদিকে মেয়ে দুটি যে কলাগাছের মতো বাড়িয়া উঠিল, এদের বিবাহের বন্দোবস্ত করিবে না ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, "কি করিয়া করিব, আশেপাশের গ্রামে ব্রাহ্মণ যুবক নাই। কার সঙ্গে মেয়ের বিবাহের যোগাড় করিব ?"

ব্রাহ্মণী বলেন, "তোমার চোখে কি ঢেলা ঢুকিয়াছে ? শুনিয়াছি, গ্রামের টোলে যে নতুন পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব কর না কেন ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কালই দুপুরে যাইয়া আমি টোলের পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিব।"

পরদিন সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ দুপুরবেলা নাপিতের টোলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেশী একজন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নাপিত মনে মনে প্রমাদ গণিল। নাজানি কোন কঠিন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই ; তাই আমার কাছে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে। হায় হায় রে! আজই বুঝি ধরা পড়িয়া যাই।

ব্রাহ্মণ নাপিতকে শুভ সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন, "দেখুন, একটা হাতি যদি কাদায় পড়ে, আর একটা হাতি দিয়া তাকে

ডাঙায় তুলিতে হয়। একটা জাহাজ যদি বালুর চরায় আটকা পড়ে, আর একখানা জাহাজ দিয়া তাহাকে টানিয়া জলে নামাইতে হয়। আমি ব্রাহ্মণ— আপনিও ব্রাহ্মণ। আমার বিপদে আপনিই শুধু আমাকে সাহায্য করিতে পারেন।" শুনিয়া নাপিতের মুখ আরও শুকাইয়া গেল। এইবার বুঝি ব্রাহ্মণ কোনো কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ! কোনো রকমে ঢোক গিলিয়া নাপিত উত্তর করিল, "তা আমি আপনার কি কাজে আসিতে পারি ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার ঘরে দুইটি মেয়ে আছে। মেয়ে দুইটি খুবই সুন্দরী। কোনো ভাল পাত্র পাই না বলিয়া এতদিন তাদের বিবাহ দিতে পারি নাই। আপনি যদি দুইটি ফুল

বেলপাতা ছড়াইয়া দিয়া উহাদের বিবাহ করেন, আমি বড়ই বাধিত হইব।"

একথা শুনিয়া নাপিতের ত খুশিতে নাচিতেই ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু মনের কথা গোপন করিয়া বলিল, "দেখুন, আমি ত জীবনে বিবাহ করিব না বলিয়াই ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি গুরুজন, যখন ধরিয়াছেন কি করিয়া আপনার কথা অমান্য করি ? আপনিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ।"

সুতরাং শুভদিনে শুভক্ষণে ব্রাহ্মণের দুই মেয়ের সঙ্গে নাপিতের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কয়েকদিন পরে শাশুড়ি জামাইকে বলিলেন, "তা বাবাজী! ওখানে তোমাকে হাত পোড়াইয়া রান্নাবান্না করিতে হয়। আমার বাড়িতে আলাদা ঘর আছে, এখানে আসিয়াই তোমরা বসবাস কর।" সেই হইতে নাপিত শ্বশুরবাড়িতেই বাস করিতে লাগিল।

শোনাশোন এই কথা নাপিতের দেশে প্রচার হইয়া পড়িল। কি চাই, অমুক গ্রামে যাইয়া হরু নাপিত ব্রাহ্মণের ভেল ধরিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দু'পয়সা উপার্জন করিতেছে। নিমাই দত্ত নামে একটি লোক মনে মনে ভাবিল, "আচ্ছা, হরু নাপিত যদি অন্য দেশে যাইয়া বামুন সাজিয়া উপার্জন করিতে পারে, আমি কায়স্থের ছেলে হইয়া কেন পারিব না ?"

একটা পৈতা কানে জড়াইয়া সেও বিদেশে যাইয়া পাড়ায় পাড়ায় লোকের ভাগ্য গণনা করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতে লাগিল।

এইভাবে এদেশে সেদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নাপিতের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল।

"কি রে হরে নাপতে, কি খবর ?"

নাপিত তাড়াতাড়ি যাইয়া দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

"সর্বনাশ, আর ও কথা কহিবেন না, আমি এই দেশে বামুন বলিয়া পরিচয় দিয়া এক বামুনের দুই মেয়ে বিবাহ করিয়াছি। যদি কেহ জানিতে পায় আমি নাপিত, তবে আর জীবন থাকিবে না। এদেশের লোক আমাকে মারিয়া ফেলিবে। এই পাঁচটি টাকা আপনাকে দিতেছি। আপনি এখনই এদেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিয়া যান।"

নিমাই দত্ত বলিল, "আমি যদি এদেশে কিছুদিন ঘুরিতে পারিতাম, তবে কম পক্ষে গোটা দশেক টাকা উপার্জন করিতাম।"

নাপিত তাহার হাতের মধ্যে আরও পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "এখনই আপনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান।"

টাকা পাইয়া নিমাই দত্ত উত্তর করিল, "সে কি আর বলিতে ! আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি। তবে তোমার বউ দুইটি কেমন বলিলে না ত?"

নাপিত বলিল, "তাহারা দুজনেই সুন্দরী, তবে বড় বউকে আমি তত আদর করি না, কিন্তু ছোটটিকে আমি অনেক গহনা শাড়ি কিনিয়া দিয়াছি।"

নাপিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিমাই দত্ত ভাবিল "দেখরে, এতদূরে যখন আসিলাম, নাপিতের বউ দুইটি দেখিয়া যাইব না ?" নিমাই দত্ত খোঁজ-খবর লইয়া নাপিতের শ্বশুরবাড়ি যাইয়া উপস্থিত।

"মা ঠাকুরুণরা! আপনারা গোনাপড়া করাইবেন ?" কথা শুনিবামাত্র বাড়ির ছেলেমেয়ে, যোয়ান-বুড়ো, সকলে মিলিয়া মৌমাছির চাকের মতো নিমাই দত্তকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এ বলে আমার হাত আগে দেখ, ও বলে আমার হাত আগে দেখ।

নিমাই দত্ত উপস্থিত সকলের হাত দেখে আর মনে মনে চিন্তা করে, "নাপিতের বউ কোন দুইটি। নাপিত আগেই বলিয়া

দিয়াছিল, তাহারা দুইজনই দেখিতে খুব সুন্দরী। বড় বোনের চাইতে ছোট বোনকে সে গহনা দিয়াছে বেশি। আর তাহারা যখন এ ওর বোন, তখন দেখিতে কতকটা একরকমই হইবে। নিমাই দত্ত সকলের ভাগ্য গণনা করে আর উপস্থিত মেয়েদের দিকে চায়। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, দুইটি মেয়ে একই রকমের দেখিতে। আর বড়জনের গায়ে তেমন অলঙ্কারপত্র নাই— ছোটজনের গায়ে অষ্ট অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে।

তখন নিমাই দত্ত বড় মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল, "আহা-হা, এই মেয়েটি সতীনের ঘরে পড়িয়াছেরে— সতীনের ঘরে পড়িয়াছে!" এ তো সত্য কথাই! সকলে তাজ্জব বনিল। নিমাই দত্ত আবার বলিল, "এই মেয়েটির সতীন আবার তার নিজের বোন। আহাহা, মেয়েটির স্বামী আবার তাকে ভালবাসেন না।" ইহাও তো পাড়ার লোকেরা জানে। তাহারা আরও তাজ্জব হইল। বড় জবরদস্ত গণক ঠাকুর। হাত না দেখিয়াই গণাপড়া করিতে পারে!

শত হইলেও মায়ের প্রাণ! নাপিতের শাশুড়ি মেয়েটির হাত ধরিয়া আনিয়া গণক ঠাকুরের সামনে দাঁড়াইল, "বাবা! দেখুন ত, কি হইলে জামাই-এর মন আমার মেয়েটির উপর পড়িবে ?"

নিমাই দত্ত অনেকক্ষণ ধ্যান ধরিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি এই মেয়েটিকে একটি মন্ত্র গোপনে বলিয়া দিয়া যাইব! সেই মন্ত্র পড়িলেই জামাই-এর মন এই মেয়েটির প্রতি প্রসন্ন হইবে। কিন্তু সেজন্য আমাকে পাঁচ সিকার পয়সা দিতে হইবে।"

মেয়ের মা তৎক্ষণাৎ গণক ঠাকুরকে পাঁচ সিকার পয়সা আনিয়া দিল। তখন সে মেয়েটিকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া একটা মন্ত্র শিখাইয়া দিল,আর বলিল, "তোমার স্বামী আজ যখন বাড়ি আসিবে, তখন যেমন করিয়াই হউক তাহাকে রাগাইয়া দিবে। রাগ করিয়া সে যখন তোমাকে মারিতে আসিবে, তখন নাপিত যেমন এক হাতের তেলোর উপর ক্ষুর ঘষিয়া ধার দেয়,

তাহার অনুকরণ করিয়া এক হাতের তেলোর উপর অপর হাত ঘষিবে আর এই মন্ত্র পড়িবে। দেখিবে তোমার স্বামীর রাগ জল হইয়া যাইবে। সে তোমার দাসানুদাস হইবে।" এই কথা বলিয়া নিমাই দত্ত চলিয়া গেল।

প্রতিদিন নাপিতের বাড়িতে বড় বউ-ই রান্নাবান্না করে। ছোট বউ বাবু হইয়া বসিয়া থাকে। বিকালবেলা আজ আর প্রতিদিনের মতো বড় বউ রান্নাবান্না করিতে যায় না। ছোট বউ বলে, "দিদি! আজ যে বড় বসিয়া রহিলে ? বেলা যে পড়িয়া গেল, রান্না করিতে যাইবে না ?"

বড় বউ ছোট বউ-এর মুখে একটা ঠোকনা দিয়া বলিল, "বলি পোড়ার-মুখী! রোজ আমি রান্না করি, আর তুমি বিবি হইয়া বসিয়া থাক। আজ তুমি যাইয়া রান্না কর।"

এই বলিয়া ছোট বউ-এর মুখে সে আর একটা ঠোকনা দিল। একে ত নাপিতের বড় আদরের বউ, তার উপরে এমনই কড়া কড়া কথা! ছোট বউ রাগে ফুলিতে ফুলিতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বড় বউ তখন বেশ করিয়া সাজিয়া গুজিয়া মাথায় তেল সিন্দুর লইয়া চৌকির উপর বিবির মতন বসিয়া রহিল।

এমন সময় নাপিত বাড়ি আসিয়া, সুন্দর একটি কথা মনে মনে ভাবিয়া, ছোট বউকে খুশি করিবার জন্য বলিল, "কি গো আমার তোতা পাখি— আমার ময়না পাখি, কি করিতেছ ? একি! তুমি যে ধুলায় গড়াইতেছ ?"

ছোট বউ কাঁদিয়া কাটিয়া আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া উত্তর করিল, "দিদি আমাকে মারিয়াছে— আর আমাকে ভাত রান্না করিতে বলিয়াছে।"

"কি, এতবড় কথা! কোথায় বড় বউ ?" বলিতে বলিতে নাপিত দেখিতে পাইল বড় বউ মাথায় তেল সিন্দুর লইয়া চৌকির উপর বিবির মতন বসিয়া আছে। তখন নাপিত খুব রাগিয়া

উঠিল, "কি, এত বড় বুকের পাটা! আমার আদরের বউকে তুমি মারিয়াছ। দেখাই তার মজা!" এই বলিয়া নাপিত একটা লাঠি লইয়া বউকে মারিতে ছুটিয়া আসিল। গণক ঠকুরের উপদেশমতো বড় বউ তখনই নাপিতের ক্ষুর ধার দেওয়ার অনুকরণে বাম হাতের তেলোর উপর ডান হাত ঘষে, আর মন্ত্র পড়ে—

"এসেছিল নিমাই দত্ত,
বলে গেছে সকল তত্ত্ব ;
তোমার এত গুণ,
তুমি নাকি এমন তেমন।"

এই মন্ত্র শুনিয়াই নাপিতের সমস্ত রাগ জল। হায়, হায়, নিমাই দত্ত তবে সব বলিয়া গিয়াছে! নাপিত তাড়াতাড়ি যাইয়া বড় বউ-এর মুখ চাপিয়া ধরে, "বলিস না—বলিস না, একথা আর কাউকে বলিস না।'

বড় বউ দেখিল মন্ত্রে কাজ হইতেছে। সে হাতের তেলোর উপর আরও জোরে জোরে হাত ঘষে আর মন্ত্র পড়ে—

"এসেছিল নিমাই দত্ত,
বলে গেছে সকল তত্ত্ব ;
তোমার এত গুণ,
তুমি নাকি এমন তেমন।"

নাপিত ছোট বউকে এক ধমক দিয়া বলে, "কি, তোকে ভাত রাঁধিতে বলিয়াছে, তাতে হইয়াছে কি ? ও হইল বড় বোন, তোর গুরুজন, ও যখন খুশি কাজ করিবে। তুই তার হইয়া কাজ করিবি।"

নাপিতের ধমক খাইয়া ছোট বউ তাড়তাড়ি উঠিয়া ভাত রাঁধিতে গেল।

সেই হইতে নাপিত বড় বউ-এর প্রতি বড়ই মনোযোগী। যদিবা নাপিত বড় বউ-এর উপর মনের ভুলে কখনও রাগ করিয়া উঠে, তখনই বড় বউ মন্ত্র পড়ে—

"এসেছিল নিমাই দত্ত,
বলে গেছে সকল তত্ত্ব ;
তোমার এত গুণ,
তুমি নাকি এমন তেমন।"

এই মন্ত্র পড়ে আর ক্ষুর ধার দেওয়ার অনুকরণে এক হাতের তেলোর উপর আর এক হাত ঘষে। নাপিতের রাগ অমনি জল হইয়া যায়।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

নাপিত ডাক্তার

ছোট্ট একটা শহর। সেখানে সবচাইতে বড় ডাক্তার হইয়া পড়িল এক নাপিত। ছোটখাটো অসুখে এটা ওটা ঔষধ দিয়াই নয়, ফোঁড়া কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া রোগীর পেট চিরিয়া পেট হইতে পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়া পর্যন্ত বড় বড় কাটাছেঁড়ার কাজও সে অতি সহজেই করিয়া দেয়।

এসব কাজ করিতে ডাক্তারেরা কত রকমের যন্ত্র লয়। ছুরি, কাঁচি ভালমতো গরম পানিতে সিদ্ধ করিয়া, পানিতে ভালমতো হাত পরিষ্কার করিয়া কত সাবধান হইয়া তাহারা রোগীর গায়ে অস্ত্র ধরে।

নাপিত কিন্তু এসবের ধারও ধারে না। সে হাতের তেলোয় তাহার ক্ষুর আর নরুন ভালমতো ঘষিয়া খসাখস বড় বড় কাটাছেঁড়ার কাজ করিয়া যায়। এমন পাকা তাহার হাত ; রোগীর পেট চিরিয়া, পেটের মধ্যে হাত দিয়া, যেখানে নাড়ির ভিতরে ফোঁড়াটি হইয়াছে, অতি সহজেই সেখানে ক্ষুর চালাইয়া পুঁজরক্ত বাহির করিয়া আনে। তারপর সাধারণ সুঁই সুতা দিয়া ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া, আর একটু হলুদ গুঁড়া মাখাইয়া দেয়। ক্ষতস্থান সারিয়া যায়। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সে বড় বড় কাটাছেঁড়ার কাজ করিয়া ফেলে। কাহারও ফোঁড়া হইয়াছে, বেদনায় চিৎকার করিতেছে। দেখি, দেখি বলিয়া নাপিত সেখানে তার ক্ষুর চালাইয়া দিয়া পুঁজরক্ত বাহির করিয়া আনে। রোগী আরাম পাইয়া আনন্দের হাসি হাসে। গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে, দুষ্ট ছেলে খেলিতে খেলিতে মারবেল-গুলি কানের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে, আর খুলিতে পারে না। নাপিত নরুনের

আগা দিয়া গলার ভিতর হইতে মাছের কাঁটা বাহির করিয়া আনে, কানের ভিতরে নরুনের আগা ঢুকাইয়া দিয়া মারবেল বাহির করিয়া আনে। শুধু কি তাই ? পিঠে ফোঁড়া হইলে তাকে বলে কারবঙ্কল। বড় বড় ডাক্তারেরা সেটা কাটিতে হিমশিম খাইয়া যায়। চোখের পলক ফেলিতে ফেলিতে নাপিত সেখানে ক্ষুর চালাইয়া দেয়।

এসব কাটাকুটিতে সব রোগীই কি ভাল হয় ? কোনোটা ভাল হয়—কোনোটা পাকিয়া বিষ লাগিয়া ফুলিয়া মরে। তা এরূপ ত ডাক্তারদের বেলায়ও হয়। তাদের হাতেই কি সব রোগী ভাল হয়?

শহরের সব লোক তাই অসুখে বিসুখে নাপিতকেই ডাকে। ডাক্তার ডাকিলে এত টাকা দাও— অত টাকা দাও, তারপর ঔষধের দাম দাও। কত রকমের ঝামেল.। নাপিতের কাছে ভিজিটের কোনো দাম-দস্তুর নাই। দুই আনা, চার আনা যার যাহা খুশি দাও। ঔষধ ত তার মুখে মুখে— গরম পানির সেক, হলুদের গুঁড়ার প্রলেপ, পেটে অসুখ করিলে আদা নুন খাও, তাতে না সারিলে জইনের গুঁড়া চিবাও, জ্বর হইলে তুলসীর পাতা, নিউমোনিয়া হইলে আকনের পাতার সেক। এসব ঔষধ বনে-জঙ্গলে, পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে মেলে। তাই সকলেই নাপিতকে দিয়া চিকিৎসা করায়।

শহরের আর আর সব পাশ করা ডাক্তারেরা রোগীর অভাবে ভাতে মরে। নাপিতের ছেলেমেয়ে দুধে ভাতে খাইয়া নাদুসনুদুস। একদিন সব ডাক্তার একত্র হইয়া ভাবিতে বসিল, কি করিয়া তাদের পসার ফিরাইয়া আনা যায়।

এক ডাক্তার বলে, "দেখ ভাই। আগে আমার বাড়িতে রোজ সকালে শত শত রোগী আসিয়া গড়াগড়ি করিত। টাকা-পয়সা ত দিতই, সেই সঙ্গে রোগ সারিলে কলাটা মূলাটা, যে দিনের যে ফল, তাও দিয়া যাইত। এই যে আমের মওসুম। আমার ছেলেমেয়েরা একটা আমও মুখে দিয়া দেখিল না! আর নাপিতের বাড়ি দেখ গিয়া...

আর এক ডাক্তার বলে, "আরে ভাই! ছাড়িয়া দাও তোমার আম খাওয়া। রোগীপত্তর আসে না। টাকা-পয়সার অভাবে এবার ভাবিয়াছি, ঔষধ মাপার পালা-পাথর, আর বুক দেখার টেথিসকোপটাও বেচিয়া ফেলিব।"

অপর ডাক্তার উঠিয়া বলে, "তুমি ত এখনও বেচ নাই। এই দুর্দিনের বাজারে চাউলের যা দাম! ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ত কবেই বেচিয়া খাইয়াছি। এবার মাথার উপরে টিনের চালা কয়খানা আছে। তাও বেচিবার লোক খুঁজিতেছি।"

ওপাশের ডাক্তার বলে, "ভায়া হে, এসব দুঃখের কথা আর বলিয়া কি হইবে ? দেখিতেছ না ? আমাদের সকলের অবস্থাই ওই একই রকম। এখন কি করা যায় তাই ভাবিয়া বাহির কর।"

অর এক ডাক্তার বলে, "দেখ ভাই! বিপদে পড়িলে বুড়ো লোকের পরামর্শ লইতে হয়। শহরের মধ্যে যে বুড়ো ডাক্তার আছেন, বয়স হইয়াছে বলিয়া এখন রোগী দেখেন না। তিনি আমাদের সকলের ওস্তাদ। চল যাই, তাঁহার নিকটে যাইয়া একটা বুদ্ধি চাই ; কি করিয়া আমাদের পূর্বের পসার বজায় রাখিতে পারি।"

তখন সকলে মিলিয়া সেই বুড়ো ডাক্তারের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। বুড়ো ডাক্তার আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা কেহ সেই নাপিতকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

নাপিত আসিলে বুড়ো ডাক্তার তাহাকে বলিলেন, "দেখ এইসব ছোকরা ডাক্তারদের কাছে শুনিতে পাইলাম, তোমার ছেঁড়াকাটার হাত খুব পাকা। তুমি একটা কজ কর। আমাদের নিকট হইতে শারীরবিদ্যাটা শিখিয়া লও। তাতে করিয়া তোমার ডাক্তারি বিদ্যাটা আরও পাকিবে।"

নাপিত বলিল, "এ অতি উত্তম কথা। আমি ত মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। আপনারা যদি কিছু শিখাইয়া দেন বড়ই উপকার হইবে।"

তখন সকল ডাক্তার মিলিয়া নাপিতকে শারীরবিদ্যা শিখাইতে লাগিল। শরীরের এখান দিয়া এই নাড়ি প্রবাহিত হয়। এইটা শিরা, এইটা উপশিরা। এইখানে ধমনী। এইখানে লিভার। হাতের এইখানে এই শিরা। কাটিলে রক্ত বন্ধ হইবে না। শরীরের ওখানে এই উপশিরা। যদি হঠাৎ কাটিয়া যায়, লোক মরিয়া যাইবে। এইখানে হৃৎপিণ্ড। এইভবে সাত আট দিন ধরিয়া সব ডাক্তার মিলিয়া নাপিতকে শারীরবিদ্যা শিখাইতে লাগিল।

নাপিত বুদ্ধিমান লোক। ডাক্তারদের যাহা শিখিতে মাসের পর মাস লাগিয়াছিল, সে তাহা সাত আটদিনে শিখিয়া ফেলিল। শুধু কি শারীরবিদ্যা ? ডাক্তারেরা তাহাকে নানারকম অসুখের জীবাণুর কথাও বলিয়া দিল। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ভালমতো পরিষ্কার করিয়া না লইলে রোগীর কি কি রোগ হইতে পারে তাহাও বুঝাইয়া দিল।

তারপর সেই বুড়ো ডাক্তারের পরামর্শমতো সকল ডাক্তার একটি রোগী আনিয়া নাপিতের সামনে খাড়া করিল। তাহার সামান্য ফোঁড়া হইয়াছিল। তাহারা তাহাকে সেই ফোঁড়া কাটিতে বলিল।

নাপিত কতরকম করিয়া হাত ধোয়। কত ঔষধ গোলাইয়া তার ক্ষুর-নরুন পরিষ্কার করে, কিন্তু তার মনের খুঁতখুঁতি যায় না। হয়তো তার হাত ভালমতো পরিষ্কার হয় নাই। হয়তো অস্ত্রে কোনো রোগের জীবাণু লাগিয়া আছে। আবার নূতন করিয়া অস্ত্র সাফ করিয়া নাপিত সেই লোকটির ফোঁড়া কাটিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তার হাত যে আজ কাঁপিয়া ওঠে। শরীরের এইখানে এই শিরা ওইখানে ওই উপশিরা। ওইখান দিয়া ক্ষুর চালাইলে রোগী মরিয়া যাইবে ; নাপিত ক্ষুর এভাবে ধরে, ওভাবে ধরে, কিন্তু ফোঁড়া কাটিতে কিছুতেই সাহস পায় না। এতদিন অজানাতে রোগীর গায়ের যেখানে-সেখানে ক্ষুর চালাইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জানিয়া শুনিয়া সে আজ রোগীর গায়ে ক্ষুর চালাইতে সাহস পায় না। ভয়ে তাহার হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িয়া গেল। নাপিত আর তাহার ক্ষুর চালাইতে পারিল না।

সেই হইতে নাপিতের পসার বন্ধ হইল। লোকেরা আবার ডাক্তার ডাকিতে আরম্ভ করিল।

তাঁতি

এক তাঁতি আর তার বউ! তারা বড়ই গরিব। কোনোদিন খায়—কোনোদিন খাইতে পায় না। তাঁত খুঁটি চালাইয়া, কাপড় বুনাইয়া, কিইবা তাহাদের আয় ?

আগেকার দিনে তারা বেশি উপার্জন করিত। তাহাদের হাতের একখানা শাড়ি পাইবার জন্য কত বাদশাজাদীরা, কত নবাবজাদীরা তাহাদের উঠানে গড়াগড়ি পাড়িত।

তখন একখানা শাড়ি বুনিতে মাসের পর মাস লাগিত। কোনো কোনো শাড়ি বুনিতে বৎসরেরও বেশি সময় ব্যয় হইত।

সেইসব শাড়ি বুনাইতে কতই না যত্ন লইতে হইত। রাত থাকিতে উঠিয়া তাঁতির বউ চরকা লইয়া ঘড়র-ঘড়র করিয়া সুতা কাটিত। খুব ধরিয়া ধরিয়া চোখে নজর আসে না, এমনই সরু করিয়া সে সুতা কাটিত। ভোরবেলায় আলো-আঁধারির মধ্যে সুতাকাটা শেষ করিতে হইত। সূর্যের আলো যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, তখন সুতা কটিলে সুতা তেমন মুলাম হইত না।

তাঁতি আবার সেই সুতায় নানারকমের রঙ মাখাইত। এত সরু সুতা আঙুল দিয়া ধরিলে ছিঁড়িয়া যায়। তাই, বাঁশের সরু শলার সঙ্গে আটকাইয়া, সেই সুতা তাঁতে পরাইয়া, কতরকমের নক্সা করিয়া তাঁতি কাপড় বুনাইত। সেই শাড়ির উপর বুনট করা থাকিত কত রাজকন্যার মুখের রঙিন হাসি, কত রূপকথার কাহিনী, কত বেহেস্তের আরামবাগের কেচ্ছা। ঘরে ঘরে মেয়েরা সেই শাড়ি পরিয়া যখন হাঁটিত, তখন সেই শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে

কত গোলেবাকওয়ালী আর কত লুবানকন্যার কাহিনী ছড়ইয়া পড়িত।

শাড়িগুলির নামই বা ছিল কত সুন্দর। কলমি ফুল, গোলাপ ফুল, মন-খুশি, রাসমণ্ডন, মধুমালা, কাজললতা, বালুচর। শাড়িগুলির নাম শুনিয়াই কান জুড়াইয়া যায়। কিন্তু কিসে কি হইয়া গেল ! দেশের রাজা গেল। রাজ্য গেল। দেশবাসী পথের ভিখারি সাজিল। বিদেশী বণিক আসিয়া শহরে কাপড়ের কল বসাইল। কলের ধুঁয়ার উপর সোয়ার হইয়া হাজার হাজার কাপড় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ; যেমন সস্তা তেমনই টেকসই। আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। তাঁতির কাপড় কে আর কিনিতে চায়!

হাট হইতে নক্সী–শাড়ি ফিরাইয়া আনিয়া তাঁতিরা কাঁদে। শূন্য হাঁড়িতে চাউল না পাইয়া তাঁতির বউ কাঁদে। ধীরে ধীরে তারা সেই মিহিন শাড়ি বুনান ভুলিয়া গেল। এখনকার লোক নক্সা চায় না। তারা চায় টেকসই আর সস্তা কাপড়। তাই তাঁতি মিলের তৈরি মোটা সুতার কাপড় বুনায়। সেই সুতা আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। চোরাবাজার হইতে বেশি দামে কিনিতে হয়। এখন কাপড় বেচিয়া যাহা লাভ হয়, তাহাতে কোনোরকমে শুধু বাঁচিয়া থাকাই যায়। এটা ওটা কিনিয়া মনের ইচ্ছামতো খাওয়া যায় না।

কিন্তু তাঁতির বউ সেকথা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। সে তাঁতিকে বলে, "তোমার হাতে পড়িয়া আমি একদিনও ভালমতো খাইতে পারিলাম না। এত করিয়া তোমাকে বলি, হাটে যাও। ভালমতো একটা মাছ কিনিয়া আন। সেকথা কানেই তোল না।"

তাঁতি উত্তর করে "এই সামনের হাটে যাইয়া তোমার জন্য ভালমতো একটা মাছ কিনিয়া আনিব।" সে হাট যায়, পরের হাট যায়, আরও এক হাট যায়, তাঁতি কিন্তু মাছ কিনিয়া আনে না।

সেদিন তাঁতির বউ তাঁতিকে ভাল করিয়াই ধরিল, "এ হাটে যদি মাছ কিনিয়া না আনিবে তবে রহিল পড়িয়া তোমার চরকা,

রহিল পড়িয়া তোমার নাটাই, আমি আর নলি কাটিব না। রহিল পড়িয়া তোমার শলা, আমি আর তেনা কাড়াইব না। শুধু শাক ভাত— আর শাক ভাত, খাইতে খাইতে পেটে চর পড়িয়া গেল। তাও যদি পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম!"

তাঁতি কি আর করে ? একটা ঘষা পয়সা ছিল, তাই লইয়া তাঁতি হাটে গেল। এ দোকান ও দোকান ঘুরিয়া অনেক দর দস্তুর করিয়া সেই ঘষা পয়সাটা দিয়া তাঁতি তিনটি ছোট্ট মাছ কিনিয়া আনিল।

মাছ দেখিয়া তাঁতির বউ কি খুশি! আহ্লাদে আটখানা হইয়া সে মাছ কুটিতে বসিল। এভাবে ঘুরাইয়া, ওভাবে ঘুরাইয়া কত গুমর করিয়াই সে মাছ কুটিল! যেন সত্য সত্যই একটা বড় মাছ কুটিতেছে। তারপর পরিপাটি করিয়া সেই মাছ রান্না করিয়া তাঁতিকে খাইতে ডাকিল।

তাঁতি আর তার বউ খাইতে বসিল। তিনটি মাছ। কে দুইটি খাইবে, আর কে একটি খাইবে, কিছুতেই তারা ঠিক করিতে

পারে না! তাঁতি বউকে বলে, "দেখ, রোদে ঘামিয়া, কত দূরের পথ হাঁটিয়া এই মাছ কিনিয়া আনিয়াছি। আমি দুইটি মাছ খাই। তুমি একটা খাও।"

বউ বলে, "উঁহু। তাহা হইবে না। এতদিন বলিয়া কহিয়া কত মান-অভিমান করিয়া তোমাকে দিয়া মাছ কিনাইয়া আনিলাম। আমিই দুইটি মাছ খাইব।" তাঁতি বলে, "তাহা কিছুতেই হইবে না।" কথায় কথায় আরও কথা উঠে! তর্ক বাড়িয়া যায়। সেইসঙ্গে রাতও বাড়ে, কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা হয় না, কে দুইটি মাছ খাইবে আর কে একটি মাছ খাইবে! অনেক বাদানুবাদ, অনেক কথা কাটাকাটি, রাতও অর্ধেক হইল। তখন দুইজনে স্থির করিল, তাহারা চুপ করিয়া ঘুমাইয়া থাকিবে। যে আগে কথা বলিবে, সে-ই একটা মাছ খাইবে।

তাঁতি এদিকে মুখ করিয়া, তাঁতির বউ ওদিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল। থালাভরা ভাত-তরকারি পড়িয়া রহিল। রাত কাটিয়া ভোর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। ভোর কাটিয়া দুপুর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই।

দুপুর কাটিয়া সন্ধ্যা হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। বেলা যখন পড়-পড়, আকাশের কিনারায় সাঁঝের কলসি ভর-ভর, পাড়ার লোকেরা বলাবলি করে, "আরে ভাই! আজ তাঁতি আর তাঁতির বউকে দেখিতেছি না কেন ? তাদের বাড়িতে তাঁতের খটর খটরও শুনি না, চরকার ঘড়র ঘড়রও শুনি না। কোনো অসুখ বিসুখ করিল নাকি ? আহা! তাঁতি বড় ভাল মানুষটি। বেচারা গরিব হইলে কি হয়, কারো কোনো ক্ষতি করে নাই কোনোদিন।"

একজন বলিল, "চল ভাই! দেখিয়া আসি ওদের কোনো অসুখ বিসুখ করিল নাকি।"

পাড়ার লোকেরা তাঁতির দরজায় আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নাই। ভিতর হইতে দরজা বন্ধ।

তখন তারা দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাঁতি আর তাঁতির বউ শুইয়া আছে। নড়ে না, চড়ে না— ডাকিলেও সাড়া

দেয় না। তারপর গাঁয়ের মোল্লা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।

আহা কি ভালবাসারে! তাঁতি মরিয়াছে, তাহার শোকে তাঁতি-বউও মরিয়া গিয়াছে। এমন মরা খুব কমই দেখা যায়। এসো ভাই আতর গোলাপ মাখাইয়া কাফন পরাইয়া এদের একই কবরে দাফন করি।

গোরস্তান সেখান হইতে এক মাইল দূরে। এই অবেলায় কে সেখানে যাইবে ? পাড়ার দুইজন ইমানদার লোক মরা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে রাজি হইল। মোল্লা সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কবর দেয়ার সময় জানাজা পড়িতে হইবে। গোরস্তানে মোরদা আনিয়া নামানো হইল ; মোল্লা সাহেব একটি খুঁটার সঙ্গে তাঁর ঘোড়াটা বাঁধিয়া সমস্ত তদারক করিতে লাগিলেন।

তাঁর নির্দেশমতো কবর খোঁড়া হইল। তাঁতি আর তাঁতির বউকে গোসল করাইয়া, কাফন পরাইয়া সেই কবরের মধ্যে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তাহাদের বুকের উপর বাঁশ চাপাইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তারপর যখন সেই বাঁশের উপর কোদাল কোদাল মাটি ফেলানো হইতে লাগিল, তখন বাঁশ-খুঁটি সমেত তাঁতি লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, "তুই দুইটা খা, আমি একটা খাব।"

সঙ্গে ছিল দুইজন লোক আর মোল্লা সাহেব। তারা ভাবিল, নিশ্চয়ই ওরা ভূত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গের দুইজন লোক মনে করিল, তাঁতি যে তার বউকে দুইটা খাইতে বলিল, নিশ্চয়ই সে তাহাদের দুইজনকে খাইতে বলিল। তখন তাহারা ঝুড়ি কোদাল ফেলিয়া দে-দৌড়, যে যত আগে পারে! মোল্লা সাহেব মনে করিলেন, তাঁতি নিজেই আমাকে খাইতে আসিতেছে। তখন

তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘোড়ার পিঠে সোয়ার হইয়া মারিলেন চাবুক। ভয়ের চোটে খুঁটি হইতে ঘোড়ার দড়ি খুলিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন।

চাবুক খাইয়া ঘোড়া খুঁটি উপড়াইয়া দিল ছুট। ঘোড়া যত চলে সেই দড়িতে বাঁধা খুঁটা আসিয়া মোল্লাসাহেবের পিঠে তত লাগে। তিনি ভাবেন, বুঝি ভূত আসিয়া তাঁর পিঠে দাঁত ঘষিতেছে। তখন তিনি আরও জোরে জোরে ঘোড়ার গায়ে চাবুক মারেন, আর দড়ি সমেত খুঁটা আসিয়া আরও জোরে জোরে তাঁর পিঠে লাগে।

হাসিতে হাসিতে তাঁতি আর তাঁতির বউ বাড়ি আসিয়া ভাত খাইতে বসিল।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কে বড়

বা–ই–শ মণ-পালোয়ান। ইয়া বড় হাত, ইয়া বড় পা। বুকে থাপ্পড় মারে, যেন পাহাড়ের গায়ে পাহাড় আসিয়া পড়ে।

সেই বাইশ-মণ-পালোয়ানের ভারি নাম-ডাক। একবার দেশে একটা বুনো হাতি আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। অমনি খবর গেল বাইশ-মণ-পালোয়ানের কাছে। বাইশ-মণ-পালোয়ান তার লেজ ধরিয়া এমনি চরকি-ঘুরুন ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিল যে, দশ মাইল দূরে সেই সুন্দরবনে যাইয়া হাতিটা ছিটকাইয়া পড়িল।

সেদিন বাইশ-মণ-পালোয়ান চলিয়াছিল পথ দিয়া। একটি বিদেশী লোক তাহাকে বলিল, "কিহে বাইশ-মণ-পালোয়ান! ভারি ত অহঙ্কারে পথে হাঁটিতে দুনিয়াখানা কাঁপাইয়া চল। আমাদের দেশের তেইশ-মণ-পালোয়ানের নাম শুনিয়াছ ? তার সঙ্গে লড়াই করিয়া যদি জিতিয়া আসিতে পার তবেই বুঝিব যে, তুমি একটা পালোয়ান বটে।"

শুনিয়া বাইশ-মণ-পালোয়ান রাগে আর বাঁচে না। তখনই তার কাছে ঠিক-ঠিকানা জানিয়া লইয়া সে চলিল তেইশ-মণ-পালোয়ানের দেশে। যাইতে যাইতে যাইতে, সকাল গড়াইয়া দুপুর হইল। যাইতে যাইতে যাইতে, দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইয়া আসিল। তখন সামনে দেখে এক প্রকাণ্ড দিঘি। এত পথ হাঁটিয়া বাইশ-মণ-পালোয়ানের বড়ই পিপাসা লাগিয়াছে। অমনি দিঘির মাঝখানে যাইয়া সে দাঁড়াইল।

দিঘিতে এত যে অথই পানি, হায়! হায়!! বাইশ-মণ-পালোয়ানের সেখানে মাত্র হাঁটু পর্যন্ত ডুবিল। পদ্মা নদীর মতো

পানি যদি গভীর হইত, তবে কোমর পর্যন্ত ডুবাইয়া অনায়াসে দুই হাত ভরিয়া সে পানি খাইতে পারিত। বেচারা আর কি করিবে! সেই পুকুরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া সে দুই হাতে দুই ধারের পানি ঠেলিয়া আনিয়া মুখে পুরিতে লাগিল,— ঘপ্-ঘপ্-ঘপ্— ঘপ্-ঘপ্-ঘপ্— ঘপ্-ঘপ্-ঘপ্। খাইতে খাইতে দিঘির প্রায় সব পানি শেষ হইয়া আসিল, তখন কেবলমাত্র কাদা-মেশানো পানি বাকি আছে— যা পান করিলে পেটে অসুখ হইবে। কোনোরকমে পানি খাওয়াটা শেষ করিয়া বাইশ-মণ-পালোয়ান আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

যাইতে যাইতে যাইতে রাত গড়াইয়া সকাল হইল। সকালবেলার বাতাসে বাইশ-মণ-পালোয়ানের কিছু আনন্দ হইল। দেখে, সামনে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। বটগাছটি বাম হাতের টানে উপড়াইয়া, তার গোড়া দিয়া সে দাঁতন করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। এইভাবে যাইতে যাইতে, তেইশ-মণ-পালোয়ানের দরজায় আসিয়া সে হাজির হইল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। মুখে সেই শিকড়-বাকড়সহ বটগাছের দাঁতন। বাইশ-মণ-পালোয়ান দরজায় ধাক্কা মারে আর ডাকে— "ও তেইশ-মণ-পালোয়ান! ও তেইশ-মণ-পালোয়ান!" ধাক্কার চোটে ঘরবাড়ি সব থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তেইশ-মন-পালোয়ান ত বাড়ি নাই, বাড়ি আছে তার ছোট মেয়েটি। দরজা খুলিয়া একটু আগাইয়া আসিয়া সে মিহি গলায় একটু বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,

"দরজার উপর অত চেঁচামেচি করে কে?"

এতবড় একজন পালোয়ন দরজায়, সেজন্য মেয়েটির মনে একটুও বিস্ময় নাই! বাইশ-মণ-পালোয়ানের গা জ্বালা করিতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি তেইশ-মণ-পালোয়ান বাড়ি আছে?"

"তাকে দিয়া তোমার কাজ কি?"

পানি যদি গভীর হইত, তবে কোমর পর্যন্ত ডুবাইয়া অনায়াসে দুই হাত ভরিয়া সে পানি খাইতে পারিত। বেচারা আর কি করিবে! সেই পুকুরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া সে দুই হাতে দুই ধারের পানি ঠেলিয়া আনিয়া মুখে পুরিতে লাগিল,— ঘপ্-ঘপ্-ঘপ্— ঘপ্-ঘপ্-ঘপ্— ঘপ্-ঘপ্-ঘপ্। খাইতে খাইতে দিঘির প্রায় সব পানি শেষ হইয়া আসিল, তখন কেবলমাত্র কাদা-মেশানো পানি বাকি আছে— যা পান করিলে পেটে অসুখ হইবে। কোনোরকমে পানি খাওয়াটা শেষ করিয়া বাইশ-মণ-পালোয়ান আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

যাইতে যাইতে যাইতে রাত গড়াইয়া সকাল হইল। সকালবেলার বাতাসে বাইশ-মণ-পালোয়ানের কিছু আনন্দ হইল। দেখে, সামনে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। বটগাছটি বাম হাতের টানে উপড়াইয়া, তার গোড়া দিয়া সে দাঁতন করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। এইভাবে যাইতে যাইতে, তেইশ-মণ-পালোয়ানের দরজায় আসিয়া সে হাজির হইল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। মুখে সেই শিকড়-বাকড়সহ বটগাছের দাঁতন। বাইশ-মণ-পালোয়ান দরজায় ধাক্কা মারে আর ডাকে— "ও তেইশ-মণ-পালোয়ান! ও তেইশ-মণ-পালোয়ান!" ধাক্কার চোটে ঘরবাড়ি সব থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তেইশ-মন-পালোয়ান ত বাড়ি নাই, বাড়ি আছে তার ছোট মেয়েটি। দরজা খুলিয়া একটু আগাইয়া আসিয়া সে মিহি গলায় একটু বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,

"দরজার উপর অত চেঁচামেচি করে কে?"

এতবড় একজন পালোয়ন দরজায়, সেজন্য মেয়েটির মনে একটুও বিস্ময় নাই! বাইশ-মণ-পালোয়ানের গা জ্বালা করিতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি তেইশ-মণ-পালোয়ান বাড়ি আছে?"

"তাকে দিয়া তোমার কাজ কি?"

"আমি বাইশ-মণ-পালোয়ান। তার সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছি। তেইশ-মণ-পালোয়ানের তুমি কি হও বটে হে?"

"আমি তার মেয়ে।" মেয়েটি অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি তোমার হাতে ওটা কি?"

বাইশ-মণ-পালোয়ান বুক ফুলাইয়া খুব গর্বের সঙ্গে উত্তর করিল, 'পথ দিয়া আসিতেছিলাম, দেখিলাম একটা বটগাছ। তা বাঁ হাতের টানে ওটাকে উপড়াইয়া দাঁতন করিতে করিতে আসিলাম।"

মেয়েটি একটু বাঁকা হাসিয়া উত্তর করিল, "বলি, এই মুরদ লইয়া তুমি আমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ! ওটা দিয়া আমার বাবা দাঁত খেলাল করেন।" এই বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া, মেয়েটি শব্দ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজায় ত শব্দ করিল না, এ যেন তার বুকের মধ্যেই হাতুড়ি দিয়া ঘা মারিল। রাগে অপমানে বাইশ-মণ-পালোয়ান অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

এতদূর আসিয়াও তেইশ-মণ-পালোয়ানের দেখা পাওয়া গেল না। বহুকাল পরে একজন মনের মতো মানুষ পাওয়া গিয়াছিল, যার সঙ্গে সত্য সত্যই লড়াই করা যাইত। বনের বাঘ-ভালুকটা, সে ত মশা-মাছির শামিল হইয়া গিয়াছে ;— ধর আর মার। বেশ মনের মতো যুদ্ধ করা যায়, এমন একজন প্রতিযোগী তার ভাগ্যে জুটিয়াও জুটিল না।

মনের দুঃখে বাইশ-মণ-পালোয়ান বাড়ি ফিরিয়া চলিল। চলিতে চলিতে সে এক মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড মাঠ। একধার হইতে আর একধার দেখা যায় না। হঠাৎ মাঠের মধ্যে ভূমিকম্পের মতো পায়ের তলার মাটি কাঁপিতে লাগিল। বাইশ-মণ-পালোয়ান মাঠের চাষীদের জিজ্ঞাসা করিল, "এত ভূমিকম্প কিসের?"

চাষীরা বলিল, "তাও জান না ? তেইশ-মণ-পালোয়ান আরঙ্গাবাদের যুদ্ধ জয় করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। তার পায়ের দাপটে মাঠের মাটি কাঁপিতেছে। ওই যে সামনে পাহাড়ের মতো দেখা যাইতেছে না ? ওই তেইশ-মণ-পালোয়ান!"

বাইশ-মণ-পালোয়ান তখন তার পরনের কাপড়খানা মালকোঁচা করিয়া পরিয়া বুকে তাল ঠুকিয়া তেইশ-মণ-পালোয়ানের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তেইশ-মণ-পালোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" আকাশ হইতে যেন বাজ পড়িল।

বাইশ-মণ-পালোয়ান তেমনি জোরে উত্তর করিল "আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছি। আমার নাম শোন নাই ? আমি বাইশ-মণ-পালোয়ান।"

তখন বাইশ-মণ-পালোয়ান আর তেইশ-মণ-পালোয়ানে লাগিল লড়াই। এদিক হইতে তাল ঠুকিয়া বাইশ-মণ-পালোয়ান তেইশ-মণ-পালোয়ানের ঘাড়ে পড়ে, ওদিক হইতে তাল ঠুকিয়া তেইশ-মণ-পালোয়ান বাইশ-মন-পালোয়ানের ঘাড়ে পড়ে। যেন পাহাড়ের উপর পাহাড় যাইয়া আছাড় খায়, যেন মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ করে! কেহ কাহারও চাইতে কম না, এ ওকে ঠেলিয়া খানিক ওদিকে লইয়া যায় ; ও আবার একে ঠেলিয়া খানিক এদিকে লইয়া আসে। তাহাদের ঠেলাঠেলির চোটে চারিদিকের মাটি আকাশ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হিমগিরির তিন চারিটি চূড়া ভাঙিয়া পড়িল।

এদিকে হইয়াছে কি ? না এক বুড়ি তার সোয়ালক্ষ ছাগল মাঠে চরাইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। ছাগলগুলি লাইন ধরিয়া বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। কিন্তু বাইশ-মণ-পালোয়ান আর তেইশ-মণ-পালোয়ানের লাফালাফিতে বুড়ির ছাগলগুলি ছড়াইয়া গড়াইয়া এলোমেলো হইয়া পড়িল। দু'চারটি ত তাহাদের পায়ের চাপে একেবারে চিড়ে চ্যাপ্টা। বুড়ি তাড়াতাড়ি সেই সোয়ালক্ষ ছাগল একটা একটা করিয়া তার ঝুলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

আর বাইশ-মন-পালোয়ানকে তার এক কাঁধের উপর খাড়া করিয়া দিয়া, তেইশ-মণ-পালোয়ানকে অন্য কাঁধের উপর উঠাইয়া দিল। তারপর বুড়ি তার লাঠিতে ভর করিয়া আধাবাঁকা হইয়া ঘরের দিকে ফিরিতে লাগিল। বাইশ-মণ-পালোয়ান আর তেইশ-মণ-পালোয়ান তার কাঁধের উপর দাঁড়াইয়া সমানে লড়াই করিতে লাগিল। এ এক লাফ দিয়া ও কাঁধে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে; ও এক লাফ দিয়া এ কাঁধে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। কেহ কাহারও চাইতে কম যায় না।

এদিকে হইয়াছে কি ? না—এক চিল বুড়ির ছাগলগুলির লোভে তাহার মাথার উপর দিয়া আকাশে ঘুরিতেছিল। সে এক ছোঁ মারিয়া সোয়ালক্ষ ছাগল আর কাঁধের উপর দুই পালোয়ানসুদ্ধ বুড়িকে আকাশে উড়াইয়া লইয়া গেল।

সে দেশের রাজকন্যা স্নানের পর ভিজা চুল এলাইয়া দিয়া ছাদের উপর রোদ পোহাইতেছিল।— হঠাৎ চিলের ছোঁ হইতে সটকাইয়া গিয়া সেই ছাগল, পালোয়ন সমেত বুড়ি, রাজকন্যার চোখের মধ্যে গিয়া পড়িল। অমনি রাজকন্যা, "চোখে কি গেল, চোখে কি গেল" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। রাজকন্যার সখীরা দৌড়াইয়া আসিল।

কত চক্‌মকি, ঝক্‌মকি, ঠক্‌ঠকি পাথরের রোশনাই জ্বালাইয়া, রাজকন্যার চোখটিকে রগড়াইয়া রগড়াইয়া তাহারা দেখিতে লাগিল। কিন্তু রাজকন্যার চোখের মধ্যে কোথাও তারা কিছু খুঁজিয়া পাইল না। খবর পাইয়া রাজা আসিলেন। মন্ত্রী-কোটাল পাত্র-মিত্র হাওলাদার, পাঞ্চাবারদার, সকলে আসিল। রাজবৈদ্য তার জড়িবড়ি ওষুধের পাটা ঘষিতে ঘষিতে আসিলেন। তার পাহাড়ের আতশি পাথরের রোশনাই জ্বালিয়া, চোখের মধ্যে একশ নিরানব্বইটি দূরবিন সাজাইয়া, রাজবৈদ্য কত যে খুঁজিলেন, কিন্তু রাজকন্যার চোখের মধ্যে কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। রাজকন্যা শুধু কাঁদিতেছে, "চোখ জ্বলে গেল, চোখ জ্বলে গেল।"

তখন রাজা, পাত্র-মিত্র, হাওলাদার, সুবেদার, পাঞ্জাবরদার, রাজবৈদ্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, জলধর

জেলেকে ডাকিয়া আনিয়া রাজকন্যার চোখের মধ্যে বেড়াজাল ফেলা হউক। যদি কোথাও কিছু ঢুকিয়া থাকে ত সেই বেড়াজালের টানে বাহির হইয়া আসিবে। অমনি রাজ-কোতোয়ালের প্রতি হুকুম হইল জলধর জেলেকে ডাকিয়া আনিতে।

রাজার হুকুম,—ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে—বাঁধিয়া আনিতে বলিলে মারিয়া আনে, আর মারিয়া আনিতে বলিলে ছাড়িয়া দিয়া আনে।

সিপাই-সান্ত্রী লইয়া রাজ-কোতোয়াল ঢুকিল জেলে-পাড়ায়। জেলেদের ঘরের দরজা ভাঙিয়া চালের ছাউনি উড়াইয়া দিয়া, জালের সুতা এলোমেলো করিয়া দিয়া, রাজ-সৈন্যেরা একেবারে একাকার কাণ্ড করিয়া তুলিল।

তবু জলধর জেলের সাড়াশব্দ নাই। ভয়ে সে মাছের খালুয়ের মধ্যে ঢুকিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে যখন দেখিল আর লুকাইয়া থাকিলে জেলে-পাড়া তচ্‌নচ্‌ হইয়া যাইবে ; জালের দড়ি ধস্‌নচ্‌ হইয়া যাইবে, তখন সে জোড়হাতে রাজ-কোতোয়ালের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজ-কোতোয়াল সদম্ভে তাহাকে রাজার আদেশ জানাইয়া দিল। রাজার আদেশ শুনিয়া জলধর জেলের ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। সে তার সোয়ালক্ষ নাতিপুতি লইয়া, জাল-দড়ি-বাঁশ মাথায় করিয়া রাজপুরীতে আসিয়া হাজির হইল।

রাজার আদেশে জেলে তখন রাজকন্যার চোখের মধ্যে বেড়াজাল ফেলিয়া সোয়ালক্ষ নাতিপুতি লইয়া টানিতে লাগিল।

তাহারা জাল টানিয়া এদিক হইতে ওদিকে লইয়া যায় ; আবার ওদিক হইতে এদিকে টানিয়া লইয়া আসে ; কিন্তু কোথাও ত কিছু জালে ঠেকে না।

দিন চলিয়া গেল, রাত হইল, রাত কাটিয়া গেল, আবার দিন আসিল। এমনি করিয়া সাত দিন সাত রাত কাটিয়া গেল। টানিতে টানিতে, রাজকন্যার চোখের পুবকোণে কি যেন একটা ঠেকিল।

সোয়ালক্ষ নাতিপুতি মিলিয়া জলধর জেলে আর পারে না; — "হেইও জোয়ান হেইও, 'হেইও জোয়ান হেইও।" টানিতে টানিতে অনেক কষ্টে তাহারা জালটাকে টানিয়া আনিয়া কিনারায় জড়ো করিল! তখন আতশি পাথরের রোশনাই জ্বালিয়া সোয়ালক্ষ দূরবিন লাগাইয়া সোয়ালক্ষ নাতিপুতি লইয়া জলধর জেলে অবাক হইয়া দেখে, জালের এক কানিতে আটকা পড়িয়া আছে সেই বুড়ি, তার কাঁধের উপর বাইশ-মণ-পালোয়ান আর তেইশ-মণ-পালোয়ান তেমনি সমানে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে।

তারা টেরও পায় নাই, ইতিমধ্যে যে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বুড়ির ঝুলির মধ্যে সোয়ালক্ষ ছাগল তেমনি আগের মতোই জমা হইয়া আছে।

চোখের ভিতর হইতে কুটোটি বাহির হইয়া গেল। রাজকন্যা হাসিয়া কথা বলিলেন।

বল ত খোকাখুকুরা, কে সবচাইতে বড়— দুই পালোয়ান, না বুড়ি, চিল, না কে?

পরের ধনে পোদ্দারী

আগে মৌলবি সাহেবের ঘন ঘন দাওয়াত আসিত। তালেব এলেমের (ছাত্রদের) কাঁধে কেতাব কোরান দিয়া বড়ই জাঁকজমকের সঙ্গে মৌলবি সাহেব দাওয়াত খাইতে যাইতেন। কিন্তু এখন খারাপ দিন পড়িয়াছে। লোকে বড় মৌলবি সাহেবের খোঁজ করে না।

অনেক দিন পরে দূরের একটা গ্রাম হইতে মৌলবি সাহেব দাওয়াত পাইলেন। বর্ষার দিন। পানির ভিতর হইতে নৌকাকানা মৌলবি সাহেব নিজেই সেচিলেন।

তাহার উপর তক্তার পাটাতন লাগাইয়া ছই বসাইলেন। কিন্তু সঙ্গে তালেব এলেম না থাকিলে ত মান থাকে না।

আগে বহু তালেব-এলেম সঙ্গে থাকিত। এখন গরিব অবস্থায় তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন তালেব-এলেমের কথা মৌলবি সাহেবের মনে হইল।

গ্রামে একজন বিধবা স্ত্রীলোক ছিল। তাহার একটিমাত্র ছেলে। পাড়া ভরিয়া ডাণ্ডা-গুলি খেলিয়া বেড়ায়। মৌলবি সাহেব সেই বিধবার বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবা বড়ই গরিব। মৌলবি সাহেবকে কোথায় বসিতে দেয় সেইজন্য খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

মৌলবি সাহেব বলিলেন, "আমার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমি সামান্য দরকারে আসিয়াছি।"

মাথার ঘোমটাটি আরও একটু টানিয়া বিধবা বলিল, "আমার মতো গরিব বিধবা আপনার কি কাজে লাগিতে পারে?"

মৌলবি সাহেব একটু কাশিয়া বলিলেন, "আমি দূরের গ্রাম হইতে একটি দাওয়াত পাইয়াছি। আপনার ছেলেকে যদি আমার সঙ্গে দেন সে আমার তালেব-এলেম হইয়া কেতাবগুলি বহিয়া লইয়া যাইবে।"

বিধবা একগাল হাসিয়া বলিল, "তাহাতে আর কি হইয়াছে, আমার ছেলেটি ত পাড়ায় পাড়ায় খেলিয়া বেড়ায়। আপনার সঙ্গে থাকিয়া যদি একটু এলেম-কালাম পড়ে সে ত ভালই হইবে। আপনি এখনই তাহাকে লইয়া যান। ওরে আরমান! তুই মৌলবি সাহেবের সঙ্গে যা।"

মৌলবি সাহেব ছেলেটির হাত ধরিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন, "আরও একটি কথা। দাওয়াতে যে যাইব, আমার পরিবার কাপড়খানাও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আপনার ডুমাখানা যদি দেন তবে লুঙ্গির মতো করিয়া পরিয়া দাওয়াতে যাইতে পারি। সেখান হইতে আসিয়াই আপনার ডুমাখানা ফেরত দিয়া দিব।"

পূর্বে গ্রামের মেয়েরা লুঙ্গির মতো করিয়া একখণ্ড কাপড় পরিত, অন্য একখণ্ড বুকে জড়াইত। তাহাকে ডুমা বলিত।

বিধবা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তা নিবেন নিন। আমারও বেশি কাপড় নাই। তা নাহয় একদিন কষ্ট করিয়াই কাটাইব।" মৌলবি সাহেব বিধবার ডুমাখানা গলায় জড়াইয়া ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি আসিলেন।

আগের দিনে মৌলবি সাহেব দাওয়াতে যাইতেন, তাকিয়া-বালিশ সঙ্গে লইতেন। তাহা দেখিয়া লোকে মৌলবি সাহেবকে কত সমীহ করিয়া চলিত। আজও কি তাকিয়া-বালিশ সঙ্গে লওয়া যায় না ? তুলার বালিশটি তেলে ময়লায় বড়ই নোংরা হইয়া আছে। তা হোক, সেটাতেই চলিবে, কিন্তু তাকিয়া কোথায় পাওয়া যাইবে ? ঘরের মধ্যে কিছু খড় ছিল, তাহা দিয়া মৌলবি সাহেব একটি তাকিয়া তৈরি করিলেন। তাহা অতি পরিপাটি করিয়া ন্যাকড়া দিয়া জড়াইয়া লইলেন। লোকে যেন বুঝিতে না পারে ইহা খড় দিয়া তৈরি। ছোকরা তালেব-এলেম সবই দেখিল। বালিশ ও তাকিয়া নৌকার ছইয়ের মধ্যে রাখিয়া মৌলবি সাহেব দাওয়াতে চলিলেন।

সারাটি পথ মৌলবি সাহেব নিজেই নৌকা বাহিয়া চলিলেন। যে-বাড়িতে যাইবেন, সে-বাড়ির ঘাটের কাছে আসিয়া বৈঠাখানা ছোকরা তালেব-এলেমের হাতে দিয়া মৌলবি সাহেব ছই-এর মধ্যে ভালমতো আমিরি-চালে যাইয়া বসিলেন।

নৌকা ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। নিমন্ত্রণ-বাড়ির লোকেরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মৌলবি সাহেবকে অতি সমাদরে নৌকা হইতে হাত ধরিয়া নামাইল। তারপর বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইল। সকলে মিলিয়া, 'হুঁকো আনরে,'—'ওজুর পানি আনরে' বলিয়া সমস্ত বাড়ি সরগরম করিয়া তুলিল।

মৌলবি সাহেব সেখানে বসিয়া আমিরি-চালে ছোকরা তালেব-এলেমকে হুকুম করিলেন, "ওরে! অমার তাকিয়া-বালিশ

লইয়া আয়।" তালেম-এলেম গরিব বিধবার পুত্র। তাকিয়া কোনটা আর বালিশ কোনটা জানে না। সে ইতস্তত করিতেছিল।

মৌলবি সাহেব ধমকের সুরে বলিলেন "ওরে কথা শুনিতেছিস না কেন ? আমার তাকিয়া-বালিশ লইয়া আয়।"

বালক দূর হইতে চেঁচাইয়া উত্তর করিল, "মৌলবি সাহেব! কোনটা আনিব ? খড়েরটা না তুলারটা ?"

জবাব শুনিয়া সভার লোক একটু মুচকি হাসিল।

মৌলবি সাহেব রাগিয়া মাগিয়া বলিলেন, "ওরে বেয়াল্লিক উল্লুক, তাকিয়া আবার খড়ের কিরে ?"

ছেলেটি উত্তর করিল, "আপনি যেটা খড় দিয়া তৈরি করিয়া ন্যাকড়া দিয়া জড়াইয়া আনিয়াছেন সেইটা আনিব নাকি ?"

সভার লোক এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া আবার হাসিল। মৌলবি সাহেব এবার আরও রাগের সঙ্গে বলিলেন, "চুপ থাক্ বেয়াদব। আমার তাকিয়া লইয়া আয়।"

ছেলেটি তখন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "মৌলবি সাহেব! আপনার রাগের কি ধার ধারি ? আপনি আমার মার ডুমাখানা লুঙ্গির মতন করিয়া পরিয়া আসিয়াছেন, সেটা আমাকে দিন। আমি বাড়ি যাই।"

— সভার লোক আবার হাসিয়া উঠিল।

টুনটুনী আর টুনটুনা

টুনটুনি আর টুনটুনা, টুনটুনা আর টুনটুনি। এ ডাল হইতে ও ডালে যায়, ও ডাল হইতে সে ডালে যায়, সে ডাল হইতে আগডালে যায়, আগডাল হইতে লাগডালে যায়, বেগুন গাছে যায়, লঙ্কাগাছে যায়, আমগাছে যায় ; জামগাছে যায় ; বল ত খোকাখুকুরা, আর কোন কোন গাছে যায় ? যে আগে বলিতে পারিবে তারই জিত।

কাঁঠাল গাছে, পেয়ারা গাছে, লিচুগাছে— আরও কত গাছে যায়। শুধু কি ফলের গাছে, ফুলের গাছে যায় না ? কি কি ফুলের গাছে যায় ? আগে বলা চাই। বুঝিয়াছি গোলাপ গাছে টগর গাছে হাসনাহেনার গাছে, কয়টা গাছের নাম করিব ? সব গাছে যায়।

সারাদিন কেবল ফুরুৎ ফুরুৎ। এ গাছ ও গাছ করিয়া টুনটুনিদের জীবন কাটে।

একদিন টুনটুনা টুনটুন করিয়া টুনটুনিকে বলে, "দেখ্ টুনটুনি! আমাদের যদি টাকা-পয়সা থাকিত তবে কি মজাই না হইত। তোকে ভালমতো একখানা শাড়িও কিনিয়া দিতে পারি না। আমি একখানা ভাল জামা-কাপড়ও পরিতে পারি না। দেশের বড় লোকেরা কত রং-বেরঙের জামা-কাপড় পরে, কেমন বুক ফুলাইয়া চলে।"

টুনটুনি বেশ গুমর করিয়া বলে, "দেখ টুনটুনা! শুনিয়াছি বনের মধ্যে নাকি সোনার মোহরভরা ঘড়া থাকে। আমি যদি তার একটা কুড়াইয়া পাই, তবে বেশ মজা হয়।"

টুনটুনা বলে, "সত্য কথাই বলিয়াছিস। দেখ্ টুনটুনি! বনের মধ্যে খুঁজিয়া পাতিয়া যেমন করিয়া হোক, একটা মোহরভরা কলস আমি বাহির করিবই।"

টুনটুনি বলে, "তা তুমি বনের মধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখ, কোথায় মোহরভরা কলসি আছে ; আমি এদিকে বাসা আগলাই।"

টুনটুনা এ বনে খোঁজে, সে বনে খোঁজে। বেতের ঝোপের আড়াল দিয়া, শিমুল গাছের গোড়া দিয়া, হিজল গাছের তলা দিয়া, কোথাও মোহরভরা কলসি পায় না।

খুঁজিতে খুঁজিতে খুঁজিতে গহন বনের ভিতর টুনটুনা এক কড়ার একটা কড়ি তালাশ করিয়া পাইল। তাই ঠোঁটে করিয়া রোদে ঘামিতে ঘামিতে, বোঝার ভারে হাঁপাইতে হাঁপাইতে, টুনটুনা ঘরে ফিরিয়া আসিল। "টুনটুনি! শিগ্‌গির আয়, শিগ্‌গির আয়! দেখিয়া যা কি আনিয়াছি!"

এই বলিয়া ঠোঁট হইতে কড়িটি নামাইয়া টুনটুনা জোরে জোরে নিশ্বাস লইতে লাগিল। টুনটুনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "বল না টুনটুনা! কি হইয়াছে ?" টুনটুনা বলে, "আগে আমাকে বাতাস কর্, যা মেহনত করিয়া আসিয়াছি!"

টুনটুনি ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া দুইখানা পাখা নাড়িয়া নাড়িয়া টুনটুনাকে বাতাস করে। কিন্তু কিযে একটা হইয়াছে জানিবার জন্য টুনটুনির মন কেবল উসখুস করিতে থাকে।

অনেকক্ষণ বাতাস করিয়া টুনটুনি বলে, "বল-না টুনটুনা! কি হইয়াছে ?"

টুনটুনা বলে, "আগে অমাার হাত পা ভাল করিয়া টিপিয়া দে, যা হয়রান হইয়া আসিয়াছি !'

টুনটুনি টুন্‌টুনার পা টিপিয়া দেয়, পাখার পালকগুলিতে ঠোঁট গুঁজিয়া আদর করিয়া দেয়। চুপটি করিয়া টুনটুনা যেন ঘুমাইয়া

পড়ে। কি যে একটা হইয়াছে শুনিবার জন্য টুনটুনির আর সয় না। অনেকক্ষণ পরে টুনটুনি টুনটুনাকে বলে, "এবার বল-না টুনটুনা কি হইয়াছে ?"

টুনটুনা বলে, "এমন একটা কিছু হইয়াছে যা কখনও হয় নাই।"

"কি হইয়াছে বল-না টুনটুনা !" টুনটুনির ধৈর্য আর মানিতে চাহে না।

টুনটুনা আরও খানিক দম লইয়া বলে, "আমরা বড়লোক হইয়া গিয়াছি।"

"বড়লোক কেমন রে টুনটুনা! বড়লোক হইলে কি হয় ?" টুনটুনি ঠোঁট উঁচাইয়া টুনটুনাকে জিজ্ঞাসা করে।

"তাই বুঝিতে পারিলি না ? এখন হইতে আমরা আর গাছের ডালে ডালে ফুলের খোঁজে ঘুরিব না, আকাশে উড়িয়া পোকা মাকড় ধরিব না, বেগুনগাছের কাঁটা খাইয়া ফুলের খোঁজেও বাহির হইব না।"

টুনটুনি চিৎকার করিয়া মরাকান্না কাঁদিয়া উঠে, "ও মাগো, তবে অমাদের কি হইবে গো! আমরা কি তবে খোঁড়া হইয়া যাইব নাকি গো?"

টুনটুনা বলে, "দূর বোকা কোথাকার! এখন আমরা বড়লোক হইয়াছি। এখনও কি গাছের ডালে ডালে পরিশ্রম করিয়া বেগুন ফুলের খোঁজে যাইব ?"

"তবে আমরা কি খাইব গো ?" টুনটুনি ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

"আরে পোড়ারমুখি! আর কি আমাদের খাওয়ার ভাবনা করিতে হইবে ?" টুনটুনা বলে।

টুনটুনি আরও একটু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তবে কেমন করিয়া খাইব ?"

টুনটুনা এক কড়ার কড়িটি দেখাইয়া বলিল, "এইটি দিয়া যা যা দরকার হয়, সব কিনিব।"

টুনটুনি বলে, "সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, মিহিদানা সব কিনিতে পারিব ? যা কিছু কিনিতে পারিব ? চকলেট, লজেন্স, বিস্কুট ?" টুনটুনি লেজ নাচাইয়া জিজ্ঞাসা করে।

টুনটুনা উত্তর করে, 'হাঁ-হাঁ সবকিছু।"

টুনটুনি বলে, "আমার গয়না, হাতের বালা, গলার মালা, কানের মাকড়ি ?"

"সবকিছু এই এক কড়ার কড়ি দিয়া কিনিব, সাইকেল কিনিব, মোটরগাড়ি কিনিব, উড়োজাহাজ কিনিব।" টুনটুনা বলে।

দুইজনে বসিয়া ভাবিয়া ঠিক করে, আর কি কি জিনিস তাহারা কিনিবে। কি কি বই কিনিবে, হাওয়া বদল করিতে কোন কোন দেশে যাইবে।

বল ত সোনামণিরা! তাহারা কি কি কিনিবে, কোন কোন দেশে যাইবে ? যে আগে বলিবে তারই জিত।

এক কড়ার কড়িটি বাসার মাঝখানে রাখিয়া টুনটুনি আর টুনটুনা তার চারদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে আর গান করে,—

"রাজার আছে যত টাকা,
মোদের আছে তত টাকা।"

তারা নায় না, খায় না, বেড়ায় না, শোয় না, ঘুমায় না, মনের আনন্দে সেই এক কড়ার কড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে আর সেই গান গায়—

"রাজার আছে যত টাকা,
মোদের আছে তত টাকা।"

একদিন হইয়াছে কি ? সেই দেশের রাজা শিকারে চলিয়াছেন। আগে পিছে মন্ত্রী-কোতোয়াল, লোক-লশকর,

পেয়াদা-পাইক কেবল গমগম করিতেছে। যাইতে যাইতে যাইতে তাহারা সেই টুনটুনি আর টুনটুনার বাসার কাছে আসিয়া উপস্থিত। তখন রাজা শুনিতে পাইলেন, টুনটুনি আর টুনটুনা গান গাহিতেছে—

"রাজার আছে যত টাকা,
মোদের আছে তত টাকা।"

কি, এত বড় বুকের পাটা! ছোট্ট এতটুকুন টুনটুনি, এক রত্তি টুনটুনা তারা গান গায়—

"রাজার আছে যত টাকা,
মোদের আছে তত টাকা।"

এতবড় রাজদ্রোহীদের সাজা হওয়া উচিত। কোনদিন তারা রাজার রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসে তার ঠিক কি!

তখন রাজা হুকুম করিলেন টিকটিকি পুলিশকে, "দেখ ত কি আছে উহাদের বাসার মধ্যে।"

টিকটিকি পুলিশ টিক্‌টিক্ করিয়া রাজ্যের যত খবর আনিয়া রাজাকে শোনায়। রাজার হুকুম পাইতে না পাইতেই টিকটিকি পুলিশ টুনটুনির বাসায় যাইয়া দেখিয়া-শুনিয়া সরেজমিনে তন্নতন্ন করিয়া খানাতল্লাশ করিয়া রাজার কাছে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! টুনটুনি পাখির বাসায় এক কড়ার একটা কড়ি আছে।"

"কি, এক কড়ার একটা কড়ির জন্য টুনটুনির এত আস্পর্ধা! ওর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর। ঘর-দোর যা কিছু আছে ভাঙিয়া ফেল।" গোস্বায় রাজা কলাপাতার মতন কাঁপিতে লাগিলেন।

রাজার মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে শহর-কোতোয়াল সৈন্যসামন্ত, দারোগা-পুলিশ লইয়া টুনটুনির বাসা ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর এক কড়ার কড়ি আনিয়া রাজকোষে জমা দিল, রাজার হাতি গিয়া টুনটুনি পাখির বাসা ভাঙিয়া পায়ের তলে পিষিয়া ফেলিল।

টুনটুনি পাখির গান তবু থামে না। তারা এ ডাল হইতে ও ডালে, ও ডাল হইতে এ ডালে আসে, রাজার মাথার উপর দিয়া ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, আর গান গায়—

"রাজার আছে যত টাকা,
মোদের আছে তত টাকা।"

কি, এত বড় রাজদ্রোহী এই টুনটুনি পাখি! স্পর্ধা ত কম না! রাজাকে অপমান ! রাজা এবার রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন।

"কে আছ, এখনই এই টুনটুনি পাখিকে বন্দী কর।" রাজার হুকুম পাইয়া শহর-কোতোয়াল হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।— সোয়ালক্ষ দারোগা, জমাদার কনস্টেবল, মার মার করিয়া উঠিলেন— সোয়ালক্ষ সিপাই সোয়ালক্ষ বন্দুক গুড়ুম করিয়া আওয়াজ করিলেন। সোয়ালক্ষ কামান কাঁধে করিয়া সোয়ালক্ষ গদাইলশকর হন হন করিয়া ছুটিল।

কিন্তু কামানের গুড়ুম আর টুনটুনি পাখির ফুরুৎ ফুরুৎ বন্দুকের ফুটুৎ ফুটুৎ আর টুনটুনি পাখির সুরুৎ সুরুৎ কিছুতেই থামে না। এদিক হইতে যদি কামান গর্জায়, টুনটুনি পাখি ওদিকে চালিয়া যায়। ওদিক হইতে যদি বন্দুক ফটকায় টুনটুনি পাখি এদিকে চলিয়া আসে।

এতটুকুন দু'টি পাখি! গায়ে বন্দুকের গুলিও লাগে না, কামানের গোলা বারুদও আঘাত করে না। সোয়ালক্ষ দারোগা

জমাদার রোদে ঘামিয়া উঠিলেন। সোয়ালক্ষ গদাইলশকর দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাপুস হুপুস হইয়া গেলেন ; কিন্তু টুনটুনি আর টুনটুনাকে ধরিতে পারিলেন না।

রাজা তখন রাগিয়া মাগিয়া অস্থির। প্রধান সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন, "যদি টুনটুনি আর টুনটুনাকে ধরিয়া আনিতে না পার, তবে তোমার গর্দান কাটিয়া ফেলিব!"

গর্দান কাটার ভয়ে প্রধান সেনাপতি বনের মধ্যে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন!

বনের মধ্যে ছিল এক কাঠুরিয়া। সে-ই প্রধান সেনাপতিকে পরামর্শ দিল, "বলি, সেনাপতি মহাশয়। কামান বন্দুক দিয়া টুনটুনি আর টুনটুনাকে ধরিতে পারিবেন না। জেলেকে ডাকিয়া বনের মধ্যে জাল ফেলিতে বলুন। সেই জালে টুনটুনি পাখি ধরা পড়িবে।"

কাঠুরিয়ার কথা শুনিয়া প্রধান সেনাপতি জেলেকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সোয়ালক্ষ নাতিপুতি লইয়া জেলে আসিয়া সমস্ত বন জুড়িয়া জাল পাতিল। সেই জালে টুনটুনি আর টুনটুনা ধরা পড়িল। টুনটুনি আর টুনটুনাকে হাতে পাইয়া রাজা ঘরে চলিলেন।

রাজার একশ এক রানী। পিলে রানী, জ্বরো রানী, কেশো রানী, বেতো রানী, মোটা রানী, পাতলা রানী, খোঁড়া রানী, তোতলা রানী, কানা রানী, বোবা রানী, আলসে রানী, চটপটে রানী, দুষ্টু রানী, মিষ্টি রানী, কত রানীর নাম আর করিব ? সব রানীরা আসিয়া রাজাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিল, কেহ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল, কেহ আলসি ভাঙিতে ভাঙিতে ভাসিল, কেহ চটপট করিয়া আসিল, কেহ ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে আসিল, সবাই আসিয়া রাজাকে ধরিল,

"মহারাজ আজ শিকারে যাইয়া কি আনিলেন ?" রাজা বলিলেন, আজ শিকারে যাইয়া টুনটুনি আর টুনটুনা পাখি ধরিয়া আনিয়াছি।" তখন পিলে রানী পিলের ভরে কোঁকাইতে কোঁকাইতে বলিলেন, "দেখি ত কেমন টুনটুনি পাখি ?"

রাজা পিলে রানীর হাতে পাখি দু'টি দিয়া রাজসভায় যাইয়া এই রাজদ্রোহী পাখি দু'টির বিচারের বন্দোবস্ত করিতে মনোযোগ দিলেন।

এদিকে পিলে রানীর হাত হইতে টুনটুনি পাখি গেল জ্বরো রানীর হাতে, তার হাত হইতে গেল কেশো রানীর হাতে, তারপর এর হাতে ওর হাতে নানা হাতে ঘুরিতে ঘুরিতে টুনটুনি পাখি যখন আলসে রানীর হাতে আসিল, অমনি টুনটুনি করিল ফুরুৎ ফুরুৎ, টুনটুনা করিল সুরুৎ সুরুৎ! দুইজন দুই দিকে পালাইল। রাজার একশ এক রানী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

পরদিন রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন ; কাশী, কাঞ্চি, কনোজ নানান দেশ হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন রাজদ্রোহী টুনটুনি আর টুনটুনা পাখির বিচার করিতে। রাজসভায় পাখিদের ডাক পড়িল। শামুকের কৌটা হইতে নস্য নাকে পুরিয়া, বড় বড় কেতাব উল্টাইয়া, পাল্টাইয়া পণ্ডিতেরা রাজদ্রোহী পাখির কি শাস্তি হইতে পারে তাই বাহির করিতে ব্যস্ত ; কিন্তু টুনটুনা আর টুনটুনি পাখি আসে না। রাজা রাগিয়া মাগিয়া রাজসভা ছাড়িয়া রানীদের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত। "কোথায় সেই রাজদ্রোহী পাখি দু'টি ?" তখন এ রানী চায় ও রানীর মুখের দিকে, ও রানী চায় সে রানীর মুখের দিকে। রাজার মাথার উপর তখন টুনটুনি পাখি উড়িয়া চলিয়াছে ফুরুৎ ফুরুৎ। রাজা সবই বুঝিতে পারিলেন। রাগিয়া মাগিয়া রাজা তখন একশ এক রানীর নাক কাটিয়া ফেলিলেন।

টুনটুনি আর টুনটুনা তখন রজার মাথার উপর দিয়া ফুরুৎ ফুরুৎ ওড়ে, আর গান গায়—

"আমি টুনা টুন-টুনাইলাম,
একশ রানীর নাক কাটাইলাম।"

কি, এত বড় বুকের পাটা টুনটুনি পাখির! রাজার কুলের কথা লইয়া ছড়া কাটে! ধর টুনটুনি পাখিকে। জেলে আবার তার সোয়ালক্ষ নাতিপুতি লইয়া রাজবাড়িতে হাজির ; পাখি দু'টি জালে ধরা পড়িল। রাজা তাহাদের হাতে পাইয়া কলাপাতার মতো কাঁপিতে লাগিলেন। এবার আর বিচার-আচারের প্রয়োজন নাই। এক গ্লাস পানি লইয়া রাজা পাখি দু'টিকে গিলিয়া খাইয়া ফেলিলেন।

তখন রাজসভায় বড় বড় পণ্ডিত বড় বড় কেতাব দেখিয়া মাথা নাড়িলেন। তাহাদের মাথানাড়া দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয় ভাবিত হইলেন। পণ্ডিতেরা মন্ত্রী মহাশয়কে সাবধান করিয়া দিলেন, "মহারাজ যদি কোন মুহূর্তে হাসিয়া উঠেন, তবে পাখি দু'টি রাজার হাসিমুখের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিবে।"

মন্ত্রী মহাশয় সেয়ান লোক। তিনি খাড়া তলোয়ার হাতে দুই সেপাইকে রাজার দুই পাশে দাঁড় করাইয়া দিলেন। যদিবা রাজা মহাশয় হাসিয়া ফেলেন, আর সেই ফাঁকে টুনটুনি পাখিরা বাহির হইয়া আসিতে চায় ; তখনি তারা তলোয়ার দিয়া মারিবে কোপ, রাজার দুই পাশ হইতে দুই টুনটুনি পাখির ঘাড়ে।

খোকাখুকুরা, তোমরা কেহ হাসিও না যেন! কেউ হাসিও না। একি হাসিয়া দিলে যে ? তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহাশয়ও যে হাসিয়া উঠিলেন! সেই হাসির ফাঁকে টুনটুনি আর টুনটুনা ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া পালাইল। রাজার দুইধার হইতে দুই সেপাই তলোয়ার উঠাইয়া মারিল কোপ। টুনটুনির গায় ত লাগিল না। লাগিল রাজা মহাশয়ের নাকে। নাক কাটিয়া দুইখান।

টুনটুনি আর টুনটুনা তখন রাজা মহাশয়ের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া বেড়ায়, আর গান গায়—

"আমি— টুনটুনা টুন-টুনাইলাম
রাজা মশাইর নাক কাটাইলাম
—নাক কাটাইলাম।"

টুনটুনীর বুদ্ধি

টুনটুনি আর টুনটুনা একসঙ্গে ত আছে। সেদিন টুনটুনি টুনটুনাকে বলে, "দেখ টুনটুনা! আমার যে বড্ড পিঠা খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।"

টুনটুনা বলে, "পিঠা তৈরি করিতে চাউল লাগে, ঢেঁকি লাগে হাঁড়ি-পাতিল লাগে, কাঠ লাগে আরও কত কি লাগে। এসব আমরা কোথায় পাইব ?"

টুনটুনি বলে, "চল, আমরা গেরস্তের বাড়ি হইতে আগে চাউল টুকাইয়া আনি। তারপর আর সব জিনিসের কথা চিন্তা করা যাইবে।"

টুনটুনি আর টুনটুনা ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া এ বাড়ি যায় ও বাড়ি যায়। ছেলেরা এখানে সেখানে কত চাউল ছড়াইয়া ফেলে। সেই চাউল ওরা টুকাইয়া লইয়া আসে।

তখন টুনটুনা বলে, "চাউলের ত জোগাড় হইল। এবার চাউল ভানিয়া গুঁড়া করিব কেমন করিয়া ?"

টুনটুনা তখন করিল কি ? যাইয়া দেখে, গেরস্তের বউ ও-ঘর হইতে ঢেঁকিঘরে যাইতেছে ! সে উঠানে একঘটি পানি ঢালিয়া দিয়া তার পথ পিছল করিয়া দিয়া আসিল। গেরস্তের বউ সেই পথ দিয়া যাইতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

টুনটুনা এই অবসরে ঢেঁকি ঘরে যাইয়া ঢেঁকির লোটে চাউল ভরিয়া ধাপুর ধোপর পার। অল্পক্ষণের মধ্যে চাউল গুঁড়া করিয়া তাহারা বাসায় ফিরিল।

কিন্তু পিঠা বানাইতে ত খাপরার দরকার। খাপরা তারা কোথায় পাইবে ? এক কুমার, হাঁড়ি-পাতিল মাথায় করিয়া বাজারে যাইতেছিল। টুনটুনি করিল কি ? তার পথের সামনে এক বদনা পানি ঢালিয়া সেই পথ পিছল করিয়া দিয়া আসিল। কুমার সেই পথ দিয়া যাইতেছে অমনি ধপাস করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। মাথার হাঁড়ি-পাতিল মুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। মনের ইচ্ছামতো টুনটুনি সেখান হইতে খাপরা টুকাইয়া আনিল।

পিঠা বানানোর গুঁড়া হইল, খাপরা হইল ; কিন্তু কাঠ পাইবে কোথায় ? টুনটুনি আর টুনটুনা এ জঙ্গল ছাড়িয়া ও জঙ্গল পার হইয়া জনমানুষের সাড়া মেলে না, এমন এক বিজাবন জঙ্গলে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া তারা দেখে গাছের উপর কত মরা ডাল শুকাইয়া খড়ি হইয়া আছে। টুনটুনি আর টুনটুনা এ ডাল ভাঙে মড়র মড়র, ও ডাল ভাঙে কড়র কড়র, সে ডাল ভাঙে চড়র চড়র। এমন সময় এক সিংহ, "হালুম মালুম খেলুম" বলিয়া ডাক ছাড়ে, "এই বনে লাকড়ি ভাঙে কারা?"

ভয়ে টুনটুনি জড় সড়
কাঁপিতে কাঁপিতে টুনটুনা পড় পড়।

সিংহ আবার গর্জন করিয়া বলে, "এই বনে লাকড়ি ভাঙে কারা ?"

টুনটুনি আর টুনটুনা অনেক সাহস করিয়া বলে—

"আমি টুনটুনি মামা!
আমি টুনটুনা মামা!

তোমাকে দাওয়াত করিতে আসিয়াছি। আজ আমাদের বাড়িতে চিতই পিঠা করিব কিনা, তাই তোমাকে বিকালে আমাদের বাড়ি যাইতে হইবে।"

একগাল হাসিয়া সিংহমামা বলে, "বেশ ভাগনে! বেশ। বেশ ভাগনী! বেশ! তোমাদের দাওয়াত কি না রাখিয়া পারা যায় ? আমি ঠিক সময়ে যাইয়া হাজির হইব।"

সাহস পাইয়া টুনটুনি বলে, "তা মামা! আমরা ত খুব ছোট, কয়টা লাকড়ি আর ঠোঁটে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব!"

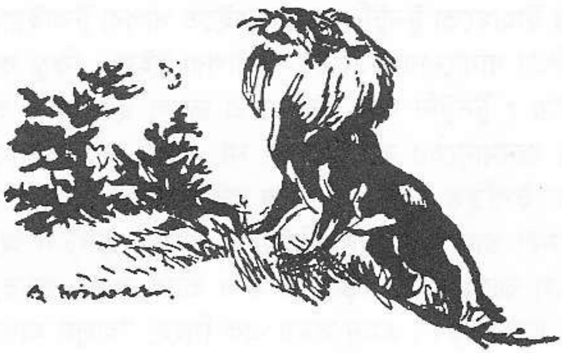

সিংহ আর একটু হাসিয়া বলিল, "তবে দাঁড়া, আমি পিঠে করিয়া তোদের লাকড়ি দিয়া আসিতেছি।" এদিকে থাবা মারিয়া, ওদিকে থাবা মারিয়া মড় মড় করিয়া অনেক লাকড়ি ভাঙিয়া সিংহ পিঠে বোঝাই করিল। টুনটুনি আর টুনটুনা আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। টুনটুনিদের বাসার সামনে আসিয়া দুড়ুম করিয়া পিঠের বোঝা নামাইয়া সিংহ চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আজ ঠিক বিকাল হইলে আমি পিঠা খাইতে আসিব।"

টুনটুনি আর টুনটুনা পিঠা বানায়। একখানা বানায় টুনটুনি খায়, আর একখানা বানায় টুনটুনা খায়। খাইতে খাইতে খাইতে তারা সকল পিঠা খাইয়া ফেলিল।

তখন টুনটুনি বলে, "দেখ টুনটুনা! সব পিঠা ত আমরাই খাইয়া ফেলিলাম। এদিকে সিংহ মামা আসিলে কি খাইতে দিব?"

দুইজনে মিলিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা করিল কি ? মাঠ হইতে শুকনা গোবর আনিয়া এক প্রকাণ্ড ভুরী বানাইল। তার উপরে একখানা পিঠা সাজাইয়া সমস্ত গোবর ঢাকিয়া ফেলিল। তারপর দুইজনে চাউলের হাঁড়ির মধ্যে লুকাইয়া সিংহমামার আসার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সিংহ আসিয়া পিঠার ভুরী দেখিয়া বড়ই খুশি। পিঠার ভুরীর চারদিকে সে ঘোরে, একখানা পিঠা তুলিয়া মুখে দেয়— আর নাচিয়া নাচিয়া গান গায়—

"টুনটুনিরে পাইতাম,
ঘাড়ে করে নাচতাম।"

এইভাবে খাইতে খাইতে উপরের পিঠাগুলি সব ফুরাইয়া গেল। তারপর একখানা গোবরের পিঠা মুখে দিয়া ওয়াক ওয়াক করিয়া ফেলিয়া দিল। তখন সিংহ মহাশয় তর্জন গর্জন করিয়া উঠিল,—

"টুনটুনিরে পাইতাম,
ঘাড় মটকায়ে খাইতাম।
টুনটুনারে পাইতাম,
ঘাড় মটকায়ে খাইতাম।"

চাউলের হাঁড়ির মধ্যে থাকিয়া টুনটুনা বলে, "টুনটুনিরে। আমার বড়ই হ্যাচ্চো পাইয়াছে।"

টুনটুনি বলে, "টুনটুনা সর্বনাশ করিলি! হ্যাঁচ্চো দিলেই সিংহ টের পাইবে। আর টের পাইলে আমাদের কি আর আস্ত রাখিবে!"

এমন সময় সিংহ গর্জন করিয়া বলিতেছে,

"টুনটুনারে পাইতাম,
ঘাড় মটকায়ে খাইতাম।
টুনটুনিরে পাইতাম,
ঘাড় মটকায়ে খাইতাম।"

কিন্তু টুনটুনা বলে, "টুনটুনিরে! আমি যে আর থাকিতে পারিতেছি না। আমার এমন হ্যাঁচ্চো পাইয়াছে।" টুনটুনি তার বুকে মাথায় পাখা ঘষে, পিঠে লেজে ঠোঁট ঘষে, "টুনটুনারে! আর একটু থামিয়া থাক।"

কিন্তু বলিলে কি হইবে! আকাশ ফাটাইয়া টুনটুনা শব্দ করিল, "হ্যাঁচ্চো।"

সেই শব্দের জোরে চাউলের হাঁড়ি ভাঙিয়া ফট্টাস, আর ভয়ে লেজ গুটাইয়া সিংহ মশায় দে চম্পট।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

জামায়ের শ্বশুর বাড়ি যাত্রা

বিবাহের পর ছেলেটি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাইবে। সে গোপনে কিছু টাকা-পয়সা সংগ্রহ করিয়া বউর জন্য একখানা শাড়ি, কয়েকগাছা চুড়ি আর একছড়া পুঁতির মালা কিনিয়া সঙ্গে লইল।

যাইবার সময় মা উপদেশ দিলেন, "বাবা! শ্বশুরবাড়ি যাইতে কাউকে সঙ্গে লইবে না। আর সেখানে গেলে তোমার শাশুড়ি তোমাকে নানারকম জিনিস খাইতে দিবে, কিন্তু তুমি যদি তার সব খাও, লোকে বলিবে, জামাই পেটুক। তাই শাশুড়ি কিছু পাতে দিতে গেলেই প্রথমে না, না বলিবে।"

ছেলে মায়ের সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্বশুরবাড়ির পথে রওয়ানা হইল।

তখন ছিল দুপুরবেলা। পথ চলিতে চলিতে দুপুরবেলা গড়াইয়া পড়িল। সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া আসিতেছে। এতক্ষণ সূর্য মাথার উপর ছিল বলিয়া সে আগে তাহাকে দেখে নাই।

সে ছায়াকে বলিতে লাগিল, "ছায়া! তুই বাড়ি ফিরিয়া যা। জানিস ত মা আমাকে একলা শ্বশুরবাড়ি যাইতে বলিয়াছে। তুই আমার সঙ্গে আসিস না।"

ছায়া তবু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসে। ছেলেটি আরও অনুনয় বিনয় করিয়া বলে, "ছায়া তুই আমার ভাই হইবি ? বন্ধু হইবি ? আমার গাই বিয়াইলে তার দুধ দিয়া তোকে লাড়ু বানাইয়া দিব। উড়কি ধানের মুড়কি খাইতে দিব। আম কাঁঠাল ভাঙিয়া দিব। তুই ডালে বসিয়া খাইস। দেখ্ তুই আমার সঙ্গে আসিস না।" ছায়া তবু তাহার পাছ ছাড়ে না।

ছেলেটি আবার বলে, "ছায়া! সোনা মানিক! তুই যদি এমন করিয়া আমার পাছ লইবি, তবে যে আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হয় না।"

ছায়া তবু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসে। ছেলেটি তখন বউ-এর জন্যে যে একছড়া পুঁতির মালা লইয়া আসিয়াছিল, তাহাই পথের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ছায়া! তুই এই মালাটি লইয়া বাড়ি ফিরিয়া যা। আমার সঙ্গে আসিস না।"

তখন একখণ্ড মেঘে সূর্য ঢাকা পড়িয়াছিল। ছেলেটি পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ছায়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে না। সে খুশি হইয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া শ্বশুরবাড়ির দিকে হাঁটিয়া চলিল।

কতক্ষণ পরে সূর্যের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল। ছেলেটি পিছন ফিরিয়া চিহিয়া দেখে, ছায়া আবার আসিয়া তাহার পাছ লইয়াছে। ছেলেটি বলিল, "ছায়া! তুই আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিস! আমার বউর জন্য দুই জোড়া কাচের চুড়ি লইয়া আসিয়াছি। তুই তাহাই লইয়া বাড়ি ফিরিয়া যা। আর আমার পিছু লইস না।"

এই বলিয়া সে দুই জোড়া চুড়ি পথের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তখন সে একটি বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ছায়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে না। ছেলেটি আরও জোরে জোরে পথে চলিতে লাগিল।

খানিক চলিয়া বনের পথ শেষ হইল। এবার পথের উপর বিকালের রোদ উঠিয়াছে। ছেলেটি পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ছায়া এবার আরও বড় হইয়া তাহার পাছে পাছে আসিতেছে।

ছেলেটি তখন আরও অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "ছায়া! তোকে আমি পুঁতির মালা দিলাম, দুই জোড়া চুড়ি দিলাম, তবু তুই আমার পাছ ছাড়িলি না ? আর ত আমার কাছে একখানা শাড়িমাত্র আছে। তাও যদি তোকে দেই, তবে বউর কাছে কি লইয়া হাজির হইব ? ছায়া! সোনা মানিক! তুই বাড়ি ফিরিয়া যা।"

ছায়া তবু যায় না। তখন শাড়িখানা পথে ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, "ছাযা! শাড়িখানা লইয়াই তুই বাড়ি ফিরিয়া যা।" এবার বেলা ডুবডুবু। সন্ধ্যা হয় হয়। ছেলেটি পিছন ফিরিয়া দেখিল, ছায়া চলিয়া গিয়াছে। সে জোরে পা ফেলিয়া নানা পথ ঘুরিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল।

জামাই শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে। শাশুড়ি কত রকমের খাবার তৈয়ার করিয়াছে। কিন্তু খাইতে বসিয়া জামাই মায়ের উপদেশ মনে মনে আওড়াইতে লাগিল। মা বলিয়া দিযাছিলেন, "শ্বশুরবাড়ি যাইয়া কম করিয়া খাইবি।"

শাশুড়ি জামাইকে খাওয়াইতে বসিয়া তার পাতে এটা দেয়—ওটা দেয়। জামাই কেবল বলে, "না! না!! আর দিবেন না।" শাশুড়ি ভাবিল, জামাইর বুঝি অসুখ করিয়াছে। তাই সে আর পীড়াপীড়ি করিল না। জামাই না খাইয়াই খাওয়া শেষ করিল।

রাত্রে শুইতে যাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় জামাইর আর ঘুম আসে না। জোর করিয়া শাশুড়ি জামাইর পাতে যেসব বড় বড় গোস্তের টুকরা, সন্দেশ, রসগোল্লা, দই, মিষ্টি ইত্যাদি কত রকমের খাবার দিয়াছিল, জামাই না খাইয়া সেগুলি পাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। *তাহারাই যেন রাতের অন্ধকারের উপর মিছিল করিয়া ঘুরিয়া* বেড়াইতেছে। জামাইর ক্ষুধার্ত জিহ্বা হইতে টস্ টস্ করিয়া পানি পড়িতে লাগিল। রাত্রি অনেক হইল ; কিন্তু দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় কিছুতেই তাহার ঘুম আসে না! বাড়ির সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কুকুর বিড়ালও জাগিয়া নাই।

জামাই ভাবে, নিশ্চয়ই রান্নাঘরে এখনও অনেক কিছু খাবার পড়িয়া আছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া অতি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল। ভয়ে তাহার বুক ঢিব্ঢিব করিতেছে। মনে হইতেছে, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুনিয়াও লোক জাগিয়া উঠিতে পারে। আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সে রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। হায়, হায়, ঘরের দরজা যে বাহির হইতে শিকল

আটকানো! দম বন্ধ করিয়া সে অতি সাবধানে সেই শিকল খুলিয়া রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

এ হাঁড়িতে পেয়াজ-রসুন,— ও পাতিলায় মুগের ডাল, ওখানে মাছকাটা বঁটি। অন্ধকারে হাতড়াইয়া কিছুই ভালমতো বুঝিবার যো নাই।

একটি হাঁড়ির ঢাকনি খুলিতে কতকগুলি মুরগির ডিম তাহার হাতে লাগিল। একে ত দারুণ ক্ষুধা—তাহার উপর খাইবারও অন্য কিছু নাই ; সে তাড়াতাড়ি দুই তিনটি ডিম উঠাইয়া মুখে পুরিল, এমন সময় অসাবধানে হাত নাড়িতে একটা হাঁড়ি আর একটা হাঁড়ির উপর পড়িয়া শব্দ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

অমনি বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিয়া উঠিল। বিড়ালের ডাক শুনিয়া উঠান হইতে বাঘা কুকুরটি ঘেউঘেউ করিয়া তাড়িয়া আসিল। শ্বশুর জাগিল, শাশুড়ি জাগিল, শালা-শালী সবাই জাগিয়া কলরব করিয়া উঠিল। এ বাড়ি হইতে—ও বাড়ি হইতে— সে বাড়ি হইতে, কেহ লাঠি লইয়া, কেহ সড়কি লইয়া, কেহ রামদা লইয়া ছুটিয়া আসিল— চোর— চোর— চোর— বাড়িতে চোর ঢুকিয়াছে!

সকলে আসিয়া দেখিল রান্নাঘরের দরজা খোলা। নিশ্চয় চোর রান্নাঘরেই লুকাইয়া আছে। ধর—ধর—চোর ধর। সকলে রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, জামাই ডিমের হাঁড়ির সামনে বসিয়া কাঁপিতেছে। শ্বশুর ডাকে "ও জামাই কি হইয়াছে ?" জামাই কোনো কথাই বলে না।

শাশুড়ি কাঁদিয়া উঠিল, "হায়! হায়! আমার জামাই বুঝি আর বাঁচিবে না!"

বাড়ির কাছে ছিল এক নাপিত-ডাক্তার। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। সে জামাইর হাতের নাড়ি পরীক্ষা করিল—বুকের ঢিবঢিবানি গনিয়া দেখিল, কিন্তু রোগের কোনোই লক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না। তারপর জামাইর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহর মুখ ফুলিয়া রহিয়াছে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নাপিত বলিল, "জামাইর মুখে ফোঁড়া হইয়াছে। তাই জামাই কথা বলিতে পারিতেছে না। ফোঁড়া কাটিয়া দিলেই জামাই কথা বলিবে।"

এই বলিয়া সে ঘচাঘচ করিয়া তাহার ক্ষুরে ধার দিতে লাগিল। ক্ষুর ধার দেওয়ার শব্দ যেন জামাইকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধার দিয়া নাপিত জামাইর মুখে যেই ক্ষুর ধরিতে যাইতেছে তখনি জামাই বলিয়া উঠিল, "আমি ডিম খাই নাই।" অমনি জামাইর মুখ হইতে দুই তিনটি ডিম বাহির হইয়া আসিল। লোকজন, পাড়াপড়শি সকলই বুঝিতে পারিল।

শাশুড়ি তাড়াতাড়ি জামাইকে খাওয়াইতে অন্য ঘরে লইয়া গেল।

চুক্তি

গ্রামের মধ্যে সবচাইতে বড়লোক আমাদের খাঁ সাহেব ; কিন্তু বড়ই কৃপণ। একটি পয়সাও তার হাতের কানি আঙুল গড়াইয়া পড়ে না। তার বাড়িতে কেহ কোনোদিন দাওয়াত খাইতে পায় না।

সেবার তাহার ছেলের বিবাহ। সমস্ত গ্রামের লোক আসিয়া ধরিল, "খাঁ সাহেব! এবার আর আপনাকে ছাড়িব না ; আপনার ছেলের বিবাহ। আমাদিগকে দই চিনি খাওয়াইতে হইবে।"

খাঁ সাহেব অনেক ওজর আপত্তি করিল, "এ বছর ক্ষেতের ধান তেমন হয় নাই। পাটের দামও কম। দই-চিনিটা বাদ দাও। আমি তোমাদিগকে মাছ-ভাত খাওয়াইব।"

কিন্তু গ্রামের লোকেরা কি তাহা মানে ? অগত্য খাঁ সাহেবকে রাজি হইতে হইল।

কিন্তু গ্রামের সমস্ত লোককে দই-চিনি খাওয়াইতে হইলে অনেক টাকা খরচ হইবে। সারারাত্র এই খরচের চিন্তায় তাহার ঘুম হইল না। শেষরাত্রে খাঁ সাহেব মনে মনে একটি ফন্দি আঁটিল।

সকাল হইলে সে মতি গোয়ালার বাড়ি যাইয়া তাহাকে ঘুম হইতে জাগাইল। মতি চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তা খাঁ সাহেব কি মনে করিয়া ?"

খাঁ সাহেব বলিল, "দেখ মতি! কাল আমার ছেলের বিবাহ। তোমাকে দশ মণ দই দিতে হইবে।"

মতি খুশি হইয়া বলিল, "সে আর এমন বেশি কথা কি ? আমি ঠিক সময়ে দই লইয়া হাজির হইব।"

খাঁ সাহেব গোয়ালাকে আরও একটু নিকটে ডাকিয়া বলিল, "দেখ মতি! এর মধ্যে আমার একটি কথা আছে। তুমি আমাকে একমণ মিষ্টি দই দিবে। আর বাদ বাকি কয়মণ দই টক করিয়া তৈরি করিবে।"

মতি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাঁ সাহেব! সকলেই ত মিষ্টি দই চায়। আপনি টক দই চান কেন ?"

খাঁ সাহেব হাসিয়া বলিল, "দেখ মতি! তুমি বুঝিবে না। তুমি যদি আমাকে মিষ্টি দই দাও, তবে দশমণে কুলাইবে না। গ্রামবাসীরা যেমন রাক্ষসের মতো খায়, বিশমণ দই না হইলে তাহাদের পেট ভরাইতে পারিব না। সে অনেক টাকার খরচ।"

গোয়ালা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা! আপনি যেমন যেমন বলিয়াছেন, সেইভাবেই দই তৈরি করিব।"

খাঁ সাহেব গোয়ালার কানে কানে বলিল, "দেখ মতি! আরও একটি কথা, তোমার টক দই খাইয়া গ্রামের লোকেরা যখন নিন্দা করিবে, তখন আমি তোমাকে খুব বকিব। কিন্তু তুমি একটি কথাও বলিতে পারিবে না। এজন্য আমি তোমার টক দইয়ের প্রতি মণের দামে আরও চার আনা করিয়া ধরিয়া দিব। মনে থাকে যেন, আমি টক দই আনার জন্য তোমাকে যতই গালাগালি দিব, তুমি টুঁ শব্দটিও করিবে না।"

মতি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

নিমন্ত্রণের দিনে গ্রামের লোক খাইতে আসিয়াছে। মাছ-ভাত খাওয়ার পর প্রত্যেকের পাতে যখন মিষ্টি দই পড়িল ; তখন সকলেই খাঁ সাহেবের তারিফ করিতে লাগিল। কিন্তু এক চামচ দুই চামচ করিয়া যখন পাতে পাতে টক দই পড়িতে লাগিল, তখন সকল লোকের মধ্যে হৈচৈ পড়িয়া গেল। কেহ খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, কেহ খাঁ সাহেবকে গালি পাড়িতে লাগিল।

খাঁ সাহেব তখন গোয়ালাকে ডাকিয়া খুব রাগের সঙ্গে বলিল, "দেখ! তুমি এত টক দই দিয়াছ কেন ?"

গোয়ালা কোনো কথা বলে না। খাঁ সাহেব গলা আরও চড়াইয়া বলে, "কি, এখন যে মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। বেটা পাজি নচ্ছার এত টাকা দাম লইয়া আমাকে টক দই দিয়াছিস ? দাঁড়া, তোকে আমি মজা দেখাইতেছি!"

গোয়ালা তখনও কোনো কথা বলে না।

খাঁ সাহেব আরও রাগিয়া বলে, "বেটা নচ্ছার! ভাবিয়াছিস তোকে আমি এমনি ছাড়িয়া দিব ? এত লোকের খাওয়া নষ্ট করিলি, তার শাস্তি তোকে দিব না ?"

তাহাকে এইভাবে বকিতে বকিতে খাঁ সাহেবের মাথা গরম হইয়া উঠিল। রাগের মাথায় গোয়ালার মুখে বিরাশির দশ অনা ওজনের এক থাপ্পড় মারিয়া বসিল।

মার খাইয়া গোয়ালা নিমন্ত্রিত লোকদের সামনে দাঁড়াইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "দেখেন, সব লোকজন আপনারা দশজনে ইহার বিচার করেন। খাঁ সাহেব কোরান শরিফ মাথায় লইয়া বলুন, দই টক হইলে আপনারা কম খাইবেন, তাই আমাকে টক দই আনার জন্য বায়না দিয়াছিলেন কি না ?

শুনিয়া গাঁয়ের সকল লোক খাঁ সাহেবের উপর ভীষণ চটিয়া গেল। খাঁ সাহেব নরম হইয়া কানে কানে আস্তে গোয়ালাকে বলিল, "কিরে মতি, তোর সঙ্গে কথা হইয়াছিল না, টক দই দেখিয়া আমি খুব রাগারাগি করিব, তুই কিছু বলিবি না? এখন কেন সকল কথা ফাঁস করিয়া দিলি?"

গোয়ালা আরও আস্তে আস্তে খাঁ সাহেবকে বলিল, "আপনার সঙ্গে চুক্তি হইয়াছিল, আপনি যতই গালাগালি করিবেন, যতই আমাকে বকিবেন, ধমকাইবেন আমি কথাটিও বলিব না। যতক্ষণ আপনি রাগারাগি করিতে থাকিবেন আমি কিছুই বলিব না। কিন্তু আপনি আমার মুখে বিরাশির দশ আনার একটি থাপ্পড় মারিলেও যে আমি কথা বলিব না, একথা ত চুক্তিতে ছিল না।"

গ্রামের সমস্ত লোকের কাছে খাঁ সাহেবের মাথা হেঁট হইল।

গুরু ঠাকুরের ভাগবত পাঠ

[আমাদের দেশে হিন্দুসামজের মধ্যে বহু জাত। বামুন, বৈদ্য আর কায়স্থ, ইহারা হইল উঁচু জাতের। আর নমঃশূদ্র, জেলে, মালী, ধোপা, এরা হইল নিচু জাতের। উঁচু জাতের লোকেরা এদের হাতের ছোঁয়া পানি পর্যন্ত খায় না। মানুষকে অবহেলা করা খুবই খারাপ। আজকাল হিন্দু-সমাজে বহু নেতা এই নিয়মের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আমাদের বাঙলাদেশে বহু নমঃশূদ্রের বাস। তাহারা খেত-খামারের কাজে বড়ই পটু। লাঠি খেলায়, নৌকা বাওয়ায়, গ্রাম্য নাচে তাহাদের জুড়ি মেলা ভার। তবু উঁচু জাতের বামুনেরা তাদের বাড়িতে পূজা করে না। তাই নমঃশূদ্রের আলাদা বামুন আছে। তারাই তাদের গুরুঠাকুর। উঁচু জাতের বামুনেরা এইসব বামুনদের বড়ই ছোট নজরে দেখে। তাদেরই কেউ হয়ত নিচের গল্পটি রচনা করিয়াছে। এখানে উঁচু জাতের একটি বামুন কি করিয়া একটি নমঃশূদ্র বামুনকে জব্দ করিয়াছিল, নিচের গল্পটি তারই পরিচয়। গল্প—গল্পই। এর মধ্যে তোমরা প্রচুর হাস্যরস পাইবে।]

গ্রামের জমিদার বাড়িতে কাশী হইতে এক ভাগবত-ঠাকুর আসিয়াছেন। তিনি জমিদার বাড়িতে রোজ ভাগবত পাঠ করেন। পাঠ করিতে করিতে তিনি কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। কত মজার মজার কেচ্ছা বলেন। তাহা শুনিতে কত ভাল লাগে— কত পুণ্য হয়। কিন্তু গ্রামের নমঃশূদ্রেরা সেখানে যাইতে পারে না। জমিদার তাহাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই। কারণ জমিদারের মতে, তাহারা ছোটজাত।

নমঃশূদ্রেরা বলাবলি করে, "দেখরে, গ্রামে আমরা পাঁচশত ঘর নমঃশূদ্র। যদি প্রত্যেকে একটাকা করিয়া চাঁদা তুলি তবে

পাঁচশত টাকা উঠে। আমরা ত ইচ্ছা করিলে একদিন ভাগবত পাঠ আমাদের বাড়িতেই দিতে পারি।" নমঃশূদ্রদের মোড়ল গ্রামের আরও দুই একজন লোককে সঙ্গে লইয়া সত্য সত্যই একদিন ভাগবত-ঠাকুরের নিকট যাইয়া উপস্থিত, "ঠাকুর মশায়। প্রণাম হই!"

ভাগবত-ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো, ব্যাপার কি ?"

"আজ্ঞে, আমরা একদিন আপনাকে আমাদের বাড়িতে লইয়া গিয়া ভাগবত শুনিতে চাই।" মোড়ল বলিল।

ঠাকুরমশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা গরিব মানুষ। আমার ভাগবত পাঠে অনেক টাকা লাগে। তোরা কি অত টাকা দিতে পারিবি?"

মোড়ল হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আমরা গ্রামে পাঁচশ ঘর নমঃশূদ্র। প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া দিলেও পাঁচশ

টাকা উঠে। দশজনে একসাথে যখন মিলিয়াছি, তখন আমরা গরিব কিসের ? আপনার ভাগবত পাঠে কত টাকা লাগিবে ?"

ঠাকুর মহাশয় জমিদার বাড়িতে ভাগবত পাঠ করিয়া প্রতি রাত্রে বড়জোর পাঁচ টাকা পান। কিন্তু যদি বেশি টাকা পাওয়া যায়— ছাড়ে কে ? তিনি বলিলেন, "তোদের বাড়িতে ভাগবত পাঠ করিলে আমাকে পাঁচশত টাকা দিতে হইবে।"

মোড়ল অতি বিনয়ের সঙ্গে বলিল, "আজ্ঞে কর্তা, আমরা গরিব মানুষ। কিছু কম করেন। আট আনার পয়সা দিব না। চারশ নিরানব্বই টাকা আট আনা, এর বেশি দিতে পারিব না।"

ঠাকুর মহাশয় মনে করিলেন, আট আনাই বা কম নেই কেন?

তিনি বলিলেন, "নারে তাহা হইবে না।"

গদাই মোড়ল গ্রমের মাতব্বর। দরদস্তুর করিয়া ভাগবতের দাম কিছু কম না করিলে ত তাহার মাতব্বরি থাকে না, সে বলিল, "আচ্ছা, নাহয় আরও চার আনা আপনাকে ধরিয়া দিলাম। একুনে দাঁড়াইল চারশ' নিরানব্বই টাকা বারো আনা। কর্তা! এতে রাজি হন।"

ভাগবত-ঠাকুর মোড়লের দর কষাকষি দেখিয়া এবার রাগিয়া গিয়াছেন। বলিলেন, "দেখ্, তোরা কি ইলিশ মাছের দোকান পাইয়াছিস?"

ঠাকুর মহাশয়ের রাগ দেখিয়া মোড়ল প্রথমে একটু থতমত খাইল, পরে কানের মধ্যে গোঁজা একটি আধলা পয়সা বাহির করিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই! যখন ছাড়িবেনই না, তখন ধরিয়া দিলাম আরও এক আধলা। একুনে দাঁড়াইল গিয়া চারশ নিরানব্বই টাকা বারো আনা আধ পয়সা। দয়া করিয়া আপনি ইহাতেই রাজি হইয়া যান।"

ঠাকুর দেখিলেন, ইহার পরে দর কষাকষি করিলে আর মান থাকিবে না। তিনি বলিলেন, "যা ইহাতেই হইবে। এখানে আর দুইদিন আমাকে ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। তারপরেই তোদের ওখানে যাইব। সব জোগাড়-যন্তর কর গিয়া।"

নমঃশূদ্রেরা বাড়ি চলিল। পথে যাইবার সময় মোড়ল তাহার সঙ্গের লোকদের খুব ভালমতোই বুঝাইয়া দিল যে সে না থাকিলে ঠাকুর মহাশয় পাঁচশত টাকার কমে কিছুতেই রাজি হইত না। সে-ই ত দর কষাকষি করিয়া পাঁচশত টাকা হইতে তিন আনা সাড়ে তিন পয়সা কমাইল। শুনিয়া তাহার সঙ্গের লোকেরা মোড়লের প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হইল।

বাড়ি যাইয়া নমঃশূদ্রেরা পরামর্শ করে, কোথায় ভাগবতের আসর বসানো যায় ? নমুদের কাহারও বাড়িতে এমন ঘর নাই যেখানে পাঁচশত লোক একসঙ্গে বসিতে পারে। তখন স্থির হইল, একজনের ধানের ক্ষেত নষ্ট করিয়া সেখানেই ভাগবতসভা দেওয়া হইবে। কিন্তু কার ধানক্ষেত নষ্ট করা যায় ?

দুখিরামের ক্ষেত কাটার কথা উঠিলে সে নয়ন পালের ধানের ক্ষেত দেখাইয়া দেয়, নয়ন পাল জগৎরামের পাটক্ষেত দেখাইয়া দেয়, জগৎরাম মহিমবালার হলদিক্ষেত দেখাইয়া দেয়। কার ক্ষেত কাটা যায়? শেষে মোড়ল যুক্তি দিল, সকলের ক্ষেতই কাটা হউক।

ভাগবত শোনার এমনই নেশা ! সমস্ত নমু মিলিয়া মাঠকে মাঠ ভর্তি, যার যত ধান পাট হলদির ক্ষেত সমস্ত কাটিয়া সাফ করিয়া ফেলিল।

জমিদার বাড়িতে ভাগবত পাঠ শোনার সময় ভদ্রলোকেরা তাকিয়া-বালিশ হেলান দিয়া বসে। নমুরা গরিব মানুষ। এসব তাহারা কোথায় পাইবে ?

তাহারা ঘাস আর বিচালির আঁটি বাঁধিয়া বড় বড় বালিশ তৈরি করিল। খড়ের গদি তৈরি করিল। ঠিক বড়লোকেরা যেভাবে ভাগবত শোনে তাহারাও তেমনি গদি বালিশে হেলান দিয়া আরাম করিয়া ভাগবত শুনিবে।

কিন্তু জমিদার বাড়ির মতন বড় শামিয়ানা ত তাহাদের নাই! কি করিয়া শামিয়ানা জোগাড় করা যায় ? মোড়লের পাকা বুদ্ধি।

স্থির হইল, যার বাড়িতে যত কাঁথা আছে, লেপ আছে, চাদর আছে, সব একত্র সেলাই করিয়া শামিয়ানা তৈরি করিতে হইবে।

প্রত্যেক বাড়ি হইতে রং-বেরঙের কাঁথা আসিতে লাগিল। কারও কাঁথা ছেঁড়া, কারও লেপের খানিকটা উই-এ খাইয়া ফেলিয়াছে। কারও চাদরে তরকারির হলুদের দাগ রহিয়াছে। কাঁথা, লেপ, চাদর, চটের ছালা সমস্ত জোড়া দিয়া সেলাই করিয়া এক বিচিত্র শামিয়ানা তৈরি হইল।

সেই শামিয়ানা ধানের ক্ষেতের মাঝখানে পাতিয়া চারকোণে চারটি খুঁটার সাথে তাহার চারকোণা বাঁধা হইল। তাহার পর প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় নারিকেলের আঁচা বাঁধিয়া সেই বাঁশে শামিয়ানার মধ্যখানটা অটকাইয়া সব নমু মিলিয়া হেইও-হেইও করিয়া ঠেলিয়া উঠাইয়া দিল। সেই অদ্ভুত শামিয়ানার তলে খড়ের গদি ও খড়ের বালিশ পাতিয়া দেওয়া হইল।

মধ্যখানে একটি ভাঙা জলচৌকি পাতা হইল। তাহার চারকোণে সিন্দুর দেওয়া হইল। চৌকির সামনে দুইটি কলসি, কলসির উপরে একখানা গামছা। ফলকথা, বড়লোকের বাড়িতে ভাগবতসভা যেভাবে সাজানো হয়, নমঃশূদ্রেরা তাহার চাইতে তাহাদের ভাগবতসভা কম করিয়া সাজাইল না।

সবকিছু ঠিকঠাক। আজই বৈকাল হইতে ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইবে, এমন সময় নমঃশূদ্রদের গুরুঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। তিনি ত সকল দেখিয়া আশ্চর্য, "কিরে ব্যাপার কি ?"

গুরুঠাকুরের পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া মোড়ল বলিল, "কাশী হইতে জমিদার বাড়িতে এক ভাগবত-ঠাকুর আসিয়াছেন। তিনি আজ আমাদের এখানে ভাগবত পাঠ করিবেন।"

গুরু মহাশয় নিজে বাঁচিয়া থাকিতে তাহার শিষ্যবাড়ি অন্য লোক ভাগবত পাঠ করিবেন ? ঈর্ষায় গুরু মহাশয়ের সকল শরীর জ্বালা করিতে লাগিল। "তা কাশীর ঠাকুর ভাগবত পাঠ করিবেন, কত টাকা লইবেন ?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মোড়ল খুব গর্বের সঙ্গে বলিল, "আগে ত পাঁচশ টাকার কমে ছাড়েনই না, তবে অনেক বলিয়া কহিয়া তিন আনা সাড়ে তিন পয়সা কমাইয়াছি।"

"আমার মাথা করিয়াছ।" গুরুঠাকুর রাগ করিয়া বলিলেন, "ভাগবত পাঠ আমি জানি না যে অন্যখানের লোক আসিয়া তোদের বাড়িতে ভাগবত পাঠ করিবে ? আর ভাগবত পাঠে কি এত টাকা লাগেরে মূর্খের দল! পাঁচ টাকা দিলেই আমি ভাগবত পাঠ করিতে পারি।"

মোড়ল বলিল, "গুরুদেব! আপনি যে ভাগবত পাঠ করিতে পারেন, এ ত আমাদের জানা ছিল না।"

গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন, "আরে মূর্খের দল! তোরা ত কিছুই জানিস না। আমি বেদ গানও জানি— রামায়ণ গানও জানি। তবে তোরা গরিব মানুষ, টাকা-পয়সা দিতে পারিস না বলিয়া তোদের কাছে এসব বিদ্যা জাহির করি না।"

নমঃশূদ্রেরা সকলে ভাবিল, "তাই ত, আমাদের গুরুঠাকুর নিজেই যখন ভাগবত পাঠ করিতে জানেন, তখন আর অন্য লোকের কাছে যাই কেন ? তা ছাড়া, গুরুঠাকুর মোটে পাঁচটি টাকা চাহিতেছেন।"

সকল নমু স্থির করিল,"তাহাই হউক। আমাদের গুরুঠাকুরই ভাগবত পাঠ করুন।"

নমঃশূদ্রেরা যেমন লেখাপড়া জানে না, তাদের গুরুঠাকুরও তেমনি লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু একটু চালাক চতুর বলিয়া নানা কলাকৌশলে তাহাদের মধ্যে নিজের সম্মান বাঁচাইয়া রাখেন।

সন্ধ্যাবেলায় তিনি শহরে যাইয়া অনেকগুলো পুরাতন পঞ্জিকা আর বিজ্ঞাপনের বই সংগ্রহ করিয়া এক কুলির মাথায় দিয়া সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত। শিষ্যেরা গর্বের সহিত বলাবলি করিল, "আমাদের গুরুঠাকুর এত বড় বিদ্বান, তাঁহার বিদ্যা মাথায় করিয়া বহিবার জন্য কুলি লাগে।"

সকলে ধরাধরি করিয়া কুলির মাথা হইতে গুরুঠাকুরের বিদ্যার বোঝা নামাইল। যত্ন করিয়া পা ধোয়াইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অন্যান্য শিষ্যেরা ত আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহারা বসিয়া এদিক ওদিক হয়, আর সেই খড়-বিচালির তাকিয়া বালিশ মচমচ করে।

তারপর প্রকাণ্ড ভুঁড়িসমেত গুরুঠাকুর সেই ভাঙা জলচৌকির উপর যাইয়া বসিলেন। গুরুঠাকুরের ভারে জলচৌকিখানি মড়মড় করিয়া উঠিল। সেখানে বসিয়া গুরুঠাকুর একে একে সেই বিজ্ঞাপন ও পুরাতন পঞ্জিকাগুলি পড়িবার ভান করিলেন। যেন বেদ, ভাগবত কত কঠিন কঠিন বইয়েরই না তিনি পাতা উল্টাইতেছেন।

আগেই বলিয়াছি নমঃশূদ্রদের গুরুঠাকুর মোটেই লেখপড়া জানেন না। ছোটকালে কয়েকদিন মাত্র পাঠশালায় গিয়াছিলেন। সেখানে ক,খ,গ,ঘ এই পর্যন্তই তিনি পড়িয়াছিলেন আর সেইটুকুই তাঁর মনে আছে। যা হোক, একখানা পুরাতন পঞ্জিকার পাতা খুলিয়া গুরুঠাকুর নাকে নস্য লইয়া কাশিয়া সেই ক, খ, গ, ঘ অক্ষরগুলিকে একটু সংস্কৃতের মতো উচ্চারণ করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, "কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়, শোন শিষ্যগণ, কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়।"

গুরুঠাকুরের সামনে নমঃশূদ্রেরা সকলে ভাগবত শুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তাহারা গরিব লোক। কতজনের কত রকম দুঃখ। সেই দুঃখ প্রকাশের এতটুকু সুযোগ পাইলেই তাহারা খানিকটা কাঁদিয়া লয়।

মহিম মারা গিয়াছে আজ দশ বৎসর। কিন্তু ভাগবত শোনার সুযোগ লইয়া মহিমের মাতা তাহার মৃত মহিমের জন্য ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বাবা মহিমরে, তুই কোথায় গেলি ?"

তারিণী ঠাকুরের সঙ্গে মামলায় হারিয়া রামমোহনকে তাহার বসত-বাড়ি বেচিতে হইয়াছে। সে মহিমের মার সঙ্গে কান্নায় যোগ দিল।

গ্রামের জমিদার সুধারামের পাঠক্ষেত হইতে জোর করিয়া পাট কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল। রামকানাই দশ বছর আগে মহাজনের বাড়ি হইতে দশ টাকা কর্জ করিয়াছিল। সুদে ফুলিয়া সেই কর্জের টাকা এখন একশত টাকায় পরিণত হইয়াছে। আজ ভাগবত শোনার সুযোগ পাইয়া তাহারা সকলেই ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মোড়ল দেখিল, সকলে কাঁদিতেছে, সে না কাঁদিলে লোকে মনে করিবে কি! তাহারও ত মনে কম দুঃখ না! সেবার সদর থানা হইতে বড় দারোগা আসিয়া তাহাকে খাতির করে নাই, অন্য গ্রামের মোড়লকে খাতির করিয়াছে। সেই কথা ভালমতো মনে করিয়া মোড়লও কাঁদিয়া উঠিল। মোড়লের কান্না দেখিয়া গুরুঠাকুর আরও উৎসাহের সঙ্গে পড়িতে লাগিল, "কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়। এমন মধুর কথা কেহ কোনোদিন শোনে নাই। বল, বল, ভক্তগণ, কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়।"

ভাগবত শুনিতে শুনিতে রাত্র যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল কেহই টের পাইল না। এমনই করিয়া প্রতিরাত্রে ভাগবত পাঠ হইতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ওপাড়ার এক ভদ্রলোক পথ দিয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন, নমঃশূদ্রেরা এ বাড়ি হইতে, ও বাড়ি হইতে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালাইয়া দলে দলে সেই শামিয়ানার দিকে যাইতেছে। খবর লইয়া জানিলেন, কি চাই, নমুদের বামুন ঠাকুর রোজ রাত্রে এমন ভাগবত পাঠ করেন যে, তাহা শুনিয়া সমস্ত গ্রামের লোক কাঁদিয়া বুক ভাসায়। শুনিয়া, ভদ্রলোকের মনে কৌতূহল হইল, "যাই, একবার শুনিয়া আসি কিরূপ ভাগবত পাঠ হইতেছে।"

ভদ্রলোক আসিয়া একপাশে বসিলেন। খানিক শুনিয়া তিনি ত অবাক! গুরুঠাকুর কেবল অনবরত "কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়" এই

শব্দ কয়টি উচ্চারণ করিতেছেন আর নমঃশূদ্রেরা শেয়ালের মতো ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে।

খানিক বসিয়া ভদ্রলোক উঠিলেন। যাইবার সময় অসতর্কে বলিয়া ফেলিলেন, "ভাগবত না, ঘোড়ার ডিম পড়িতেছে।"

এই কথা কয়টি গুরুঠাকুরের কানে গেল। গুরুঠাকুর সহসা পাঠ বন্ধ করিলেন।

শিষ্যেরা গুরুঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গুরুঠাকুর বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ শিষ্যগণ! এই যে মধুর ভাগবত— ইহার মর্ম অরসিক লোক কি বুঝিবে ? তাই ত হরি বলিয়াছেন, কেবলমাত্র ভক্তের কাছে হরিনাম করিও। কিন্তু আমার একটি কথা।"

মোড়ল হাত জোড় করিয়া বলিল, "কি কথা, গুরুদেব ?"

গুরুঠাকুর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কথা আর বিশেষ কিছু নয়! এই যে ভদ্রলোক উঠিয়া গেলেন, এইসব পোশাকপরা লোকেরা ভাগবত পড়ার মর্মকথা বুঝিতে পারে না। সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নাই। তবে কিনা তোমরা আমার পাঁচশ ঘর শিষ্য এখানে উপস্থিত থাকিতে আমার ভাগবত পাঠকে কি না বলিয়া গেল ঘোড়ার ডিম।"

মোড়ল গর্জন করিয়া উঠিল, "কি, এত বড় কথা! কি করিতে হইবে গুরুদেব ?"

গুরুদেব বলিলেন, "কি করিতে হইবে, তা কি আমাকে বলিয়া দিতে হইবে ? তোমরা পাঁচশ ঘর শিষ্য ইহার বিহিত করিতে পার না ?"

এই কথা শুনিয়া পাঁচশ নমঃশূদ্র খেপিয়া গেল। ভদ্রলোক তখনও বেশি দূর যান নাই। ধরিয়া আনিয়া নমঃশূদ্রেরা তাহাকে পাড়িয়া ফেলিয়া যার যত খুশি কিল, থাপ্পড়, ঘুষি দিতে লাগিল।

এত লোকের মার খাইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ভদ্রলোক বাড়ি ফিরিলেন। গায়ের ব্যথায় সারারাত ঘোরতর জ্বর। পরদিন

সকালে ভদ্রলোকের ছোটভাই জিজ্ঞাস করিল, "দাদা! রাতভর ত তোমার খুব জ্বর দেখিলাম আর গায়ের ব্যথায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলে, এরূপ হওয়ার কারণ কি ?"

মার খাইয়া কে তাহা স্বীকার করিতে চায়! ভদ্রলোক বলিলেন "এমনিই আমার জ্বর হইয়াছে। আর জ্বর হইলেই ত গায়ে ব্যথা হয়।"

কিন্তু ছোটভাই নাছোড়বান্দা। সে তবু জিজ্ঞাসা করে, 'না দাদা! হঠাৎ তোমার গায়ে ব্যথাই বা হইল কেন ? নিশ্চয়ই ইহার কোনো কারণ আছে।" তখন ভদ্রলোক সমস্ত ব্যাপার ছোটভাইকে খুলিয়া বলিলেন।

ছোটভাই বলিল, 'দাদা! তুমি কোনো চিন্তা করিও না। আমি ইহার প্রতিশোধ লইতেছি।"

ভদ্রলোক বলিলেন "ওরা সংখ্যায় পাঁচশত। ওদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তুমি পারিবে না। আমারই মতো মার খাইয়া ফিরিয়া আসিবে।"

ছোটভাই বলিল, "দাদা! তুমি কোনো চিন্তা করিও না। আমি কৌশলে ওদের জব্দ করিয়া আসিব।"

সারাদিন বসিয়া ছোটভাই নানারকম ফন্দি-ফিকির আওড়াইতে লাগিল। সন্ধ্যা হয়-হয়। এমন সময়ে সে গায়ে একখানা নামাবলী জড়াইয়া কপালে বুকে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া দিব্যি এক হিন্দু সাধু সাজিয়া খড়ম পায়ে চটর চটর করিয়া নমঃশূদ্রদের পাড়ার দিকে রওয়ানা হইল।

বহুক্ষণ হয় ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। গুরুঠাকুরের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া নমঃশূদ্রেরা মাঝে মঝে সুর করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। এমন সময় খড়ম পায়ে নামাবলী গায়ে, কপালে বুকে ফোঁটা-তিলক পরিয়া ছোটভাই সভামণ্ডপে গুরুঠাকুরের একেবারে সামনে যাইয়া, মাটিতে শুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল। তারপর গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা খানিকটা মাথায় লইয়া, খানিকটা জিহ্বায় ঠেকাইয়া বলিল, "গুরুদেব। অধমকে দয়া করেন!"

একজন সাধুব্যক্তির এরূপ ভক্তি দেখিয়া গুরুঠাকুর খুব খুশি হইলেন। তিনি আজ আরও উৎসাহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন, "বল, বল ভক্তগণ, কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়— কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়। এমন মধুর নাম আর কখনও শুনিবে না।" নমঃশূদ্রেরা সকলেই একযোগে চিৎকার করিয়া উঠিল, কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়— কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়!"

সাধুবেশধারী ছোটভাই মাটির উপর আরও একটি প্রণাম করিয়া হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গুরুঠাকুরও উৎসাহের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "এমন মধুর নাম আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। এই নামের মোহে ভুলিয়া রামছাগল ঘাস খাইতে খাইতে ঘন ঘন দাড়ি নাড়ে। বোলতার চাক মাথায় পরিয়া শেয়াল মামা সারারাত ভরিয়া হুক্কা-হুয়া করিয়া এই নাম উচ্চারণ করে— ভীমরুলের বাসায় বসিয়া বসিয়া দিনরাত রামভালুক এই নাম কান পাতিয়া শোনে। বল, বল ভক্তগণ, কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়।"

সাধুবেশধারী ছোটভাই তখন গুরুঠাকুরের পা'খানা টানিয়া লইয়া বলিল, "আহা-হা, গুরুদেব! কি মধুর নাম শুনাইলেন! আপনার পা'খানা একবার আমার বুকের উপর রাখুন।"

উৎসাহ পাইয়া গুরুঠাকুর আরও জোরে জোরে বলিতে লাগিলেন, "কিয় ক্ষিয় ঘিয়— কিয় ক্ষিয় ঘিয়।"

সারারাত্র এইভাবে ভাগবত পাঠ চলিতে লাগিল! সাধুবেশধারী ছোটভাই একবার মাটিতে গড়াগড়ি যায় ; আবার গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দেয়, আর মাঝে মাঝে গুরুদেবের মুখের দিকে চায়।

সারারাত এইভবে "কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়" বলিতে বলিতে ঠাকুর মহাশয়ের মুখে থুথু আসিয়া যায়। তখন সামনের গাড়ুর উপর হইতে গামছাখানা লইয়া তিনি মুখ মোছেন। হঠাৎ ছোট ভাই গামছাখানার উপর হইতে কি একটা জিনিস পাইয়া ট্যাঁকে

গুঁজিয়া, খড়ম পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চিৎকার করিয়া উঠিল, "পাইয়াছিরে, আমি পাইয়াছি।"

সভায় সকল লোক জিজ্ঞাসা করিল, "আরে কি পাইয়াছেন আপনি?"

সে খড়ম বগলে করিয়া নাচিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "যে জিনিস পাইলে মাজা দোলাইয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, যে জিনিস তাবিজ করিয়া পরিলে কোনো অসুখ থাকে না, যে জিনিস সঙ্গে থাকিলে মারামারিতে কেহ হারাইতে পারে না, আমি সেই জিনিস পাইয়াছি।"

চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া নানাজনে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মোড়ল তাহাদিগকে থামাইয়া জোড়হাতে বলিল, "আপনি কি জিনিস পাইয়াছেন, আমাদিগকে দেখান।" ছোট ভাই তখন তাহার ট্যাঁক হইতে একগাছি দাড়ি বাহির করিয়া বলিল, "যে মুখ হইতে এমন মধুর ভাগবত বাহির হইতেছে সেই মুখের একগাছা দাড়ি। ইহা যার সঙ্গে থাকিবে, তার চৌদ্দ পুরুষ স্বর্গে যাইবে।"

মোড়ল তখন বলিল, "এমন জিনিস আপনি লইয়া যাইতেছেন তাহা আমরা দিব না। ওটা রাখিয়া যান।"

ছোটভাই বলিল, "আমি ত মাত্র একটা দাড়ির আঁশ পাইয়াছি। গুরুঠাকুরের মুখভরা কত দাড়ি আছে, তোমরা টানিয়া লও না কেন ?" যেমনি বলা অমনি পাঁচশত নমু ছুটিয়া আসিল গুরুঠাকুরের দিকে।

গুরুঠাকুর কেবল বলেন, "আরে তোরা করিস কি ? করিস কি ?"

কার কথা কে শোনে! চৌকির উপর হইতে গুরুঠাকুরকে ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মাটিতে ফেলিয়া এক একজন এক এক গাছা দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দাড়ি ছেঁড়ার ব্যথায় গুরুঠাকুর

যতই চিৎকার করিয়া কাঁদেন, ততই তাহারা অতি উৎসাহে দাড়ি ছিঁড়িতে থাকে। সমস্ত দাড়ি যখন ছেঁড়া শেষ হইল, তখন পুণ্যলোভী নমুরা গুরুঠাকুরের মাথার চুলও বাদ দিল না। ইত্যবসরে ছোটভাই খড়ম বগলে করিয়া সেখান হইতে পালাইয়াছে।

সত্যকার আলসে

আগেকার দিনে রাজা-বাদশাদের নানারকমের অদ্ভুত খেয়াল থাকিত। এখনকার মতো দেশের অর্থ ব্যয় করিতে তাহাদের কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহি করিতে হইত না। তাই খেয়ালখুশিমতো তাহারা টাকা-পয়সা খরচ করিতেন। এখনকার রাজারা কিন্তু এরূপ পারে না।

তখন প্রত্যেক রাজবাড়িতে কতকগুলি অলস লোক থাকিত। রাজারা আলসেখানায় সেই অলস লোকগুলিকে দেখিয়া বড়ই আমোদ পাইতেন। অলস লোকদের লইয়া রাজায় রাজায় আবার প্রতিযোগিতাও হইত। কোনো রাজার আলসেখানায় যদি সবচাইতে খুব নামকরা আলসে থাকিত, সেই রাজার খুব সুনাম হইত।

সেবার দেখা গেল, রাজার রাজ্যের যত লোক কেহ কাজ করে না। সকলে আসিয়া জুটিয়াছে রাজার আলসেখানায়। কারণ সেখানে আসিলেই যত খুশি ভাতমাছ দুধ-মাখন খাইতে পাওয়া যায়। কে আর কাজ করে! রাজা মুশকিলে পড়িলেন।

তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখরে মন্ত্রী ! আমার রাজ্যে কেহই কাজ করে না। সকলেই আলসেখানায় আসিয়া জুটিয়াছে। আলসেদের খাওয়াইতেই রাজস্বের সব খরচ হইয়া যায়। তুমি ইহার কোনো উপায় বলিতে পার ?"

মন্ত্রী হাতজোড় করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি ইহার প্রতিকার করিতেছি।"

সেদিন দুপুরবেলা রাজার আলসেখানায় সকল অলস ব্যক্তি বিছানায় গড়াগড়ি যাইতেছে, এমন সময় মন্ত্রীর আদেশে

আলসেখানার ঘরে আগুন দেওয়া হইল। আগুনের আঁচ পাইয়া একে একে সকল আলসে পালাইয়া গেল।

কিন্তু দুইজন আলসে যেমন শুইয়া ছিল, তেমনি শুইয়া রহিল, আগুন যখন তাদের মাথার উপর আসিয়াছে, তখন একজন আলসে গা মোড়ামুড়ি দিয়া দ্বিতীয় আলসেকে বলিল, "কত রবি জ্বলে!" (কেমন সূর্য জ্বলিতেছে !)

দ্বিতীয় অলস ব্যক্তি যেমন শুইয়া ছিল, তেমনিভাবে শুইয়াই উত্তর করিল, "কেবা আঁখি মেলে।" (সূর্য উঠিয়াছে তাহাতে কি হইয়াছে ? কে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে ?)

রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন এই দুইজনই সত্যিকার আলসে। রাজার লোকেরা তখন ধরাধরি করিয়া সেই দুইজন অলস ব্যক্তিকে আগুনের হাত হইতে বাঁচাইল। সেই হইতে তাহারা দুইজনই মাত্র রাজার আলসেখানায় রহিল।

পরে সব আলসে যার যার বাড়ি যাইয়া কাজকর্ম করিতে লাগিল।

ঠেলাঠেলির ঘর

একজনের দুই বউ। কথায় বলে, "ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর।" দুই বউকে লইয়া স্বামী বেচারির বড়ই মুশকিল। তারা একে অপরের দোষ ধরিবার জন্য সব সময় সতর্ক হইয়া থাকে। এক বউকে কোনো কাজ দিলে সে অপর বউর ঘাড়ে চাপাইতে চায়।

স্বামী গিয়াছে হাল বাহিতে মাঠে। দুই বউ ঠেলাঠেলি করিয়া রান্না করে নাই। দুপুরবেলা বাড়ি আসিযা স্বামী ভাত পায় না। বাড়ির ধারে বেগুন ক্ষেতে পানি দেওয়ার কথা। এ বউ বলে, তুমি পানি দাও, ও বউ বলে, তুমি পানি দাও। মাঝখান দিয়া বেগুন ক্ষেতে পানি না দেওয়াতে একদিনের রোদেই চারাগাছগুলি শুকাইয়া যায়।

অনেক ভাবিযা চিন্তিয়া স্বামী বউদের যার যার কাজ ভাগ করিয়া দিল, আর একদিন অন্তর এক একজনকে রান্না করিতে বলিল।

আজ বড় বউয়ের রান্নার পালা। ছোট তাকে তাকে আছে। যেই বড় বউ একটু ওদিকে গিয়াছে, অমনি ছোট বউ আসিয়া তরকারির হাঁড়িতে অনেকখানি নুন ঢালিয়া দিয়া গেল। খাইবার সময় নুনের জন্য কেহই খাইতে পারিল না। বড় বউর বদনাম হইল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল ইহা কাহার কাজ।

পরদিন ছোট বউর রান্নার পালা। কাল বড় বউর রান্নার বদনাম হইয়াছে। আজ ছোট বউ এমন রান্না করিবে যে, বাড়ির লোক খাইয়া ধন্য ধন্য করিবে। কত সুন্দর করিয়া বাটনা বাটিয়া, এটা ওটা মশল্লা দিয়া ছোট বউ অতি পরিপাটি করিয়া রান্না করিতেছে। যেই ছোট বউ একটু ওদিকে গিয়াছে, অমনি বড় বউ আসিয়া তরকারির মধ্যে অনেকখানি মরিচের গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া

গেল। ঝালের জন্য সেদিন কেহই খাইতে পারিল না। বাড়ির সকলে ছোট বউর রান্না লইয়া ছি ছি করিতে লাগিল।

এমনি আজ তরকারিতে ঝাল বেশি, কাল নুন বেশি, পরশু হলুদ বেশি। স্বামী বেচারা বড়ই মুস্কিলে পড়িল ; কিছুতেই ধরিতে পারে না কে এমন কাজ করে।

সেদিন রান্না করিয়াছিল ছোট বউ। তরকারিতে এত নুন হইয়াছে যে, মুখেও দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বামী একটু চালাকি করিল। সে খাইতে খাইতে বলিল, "আজ যে তরকারিতে মোটেই নুন পড়ে নাই ; এমন নুন ছাড়া তরকারি কি খাওয়া যায় ?"

তখন বড় বউ বলিল, "ও তো একেবারেই নুন দিয়াছিল না, আমি আড়ালে থাকিয়া সামান্য একটু ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তাই খাইতে পারিলে। নইলে আজ তোমার খাওয়াই হইত না।" তখন স্বামী বড় বউর চুলের মঠি ধরিয়া মারিল এক কিল, "তবেরে শয়তানী! তুই লুকাইয়া তরকারিতে নুন দিয়াছিলি ?"

তারপর ছোট বউকেও ধমকাইয়া বলিল, "আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। তোরা একজন অপর জনের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে একে অপরের তরকারিতে নুন ফেলিয়া দিস, ঝাল ফেলিয়া দিস। এরপর যদি কারো রান্নায় নুন-ঝাল বেশি হয়, তবে দুইজনেরই চুলের মুঠি ধরিয়া এইভাবে মারিব।"

সেই দিন হইতে দুই বউ ভালমতো রান্নাবান্না করিতে লাগিল।

দিগবিজয়ী পণ্ডিত

এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। মহাপণ্ডিত। অনুস্বর বিসর্গভরা বড় বড় কথা তার মগজের মধ্যে গিজগিজ করিতেছে। সেই পণ্ডিত যে দেশে যান, সেই দেশের পণ্ডিতদের তর্ক করিতে ডাকেন। তাঁর তর্কের শর্ত এই, যে তার সঙ্গে হারিবে, পণ্ডিত মহাশয় তার টিকি কাটিয়া লইবেন। আর পণ্ডিত মহাশয় যদি হারেন, তবে যে তাঁকে হারাইবে, সে তাঁর টিকি কাটিয়া লইবে।

কাশী, কাঞ্চি, কনোজ, সমস্ত দেশের পণ্ডিতসমাজকে হারাইয়া তাহাদের মাথা টিকি-শূন্য করিয়া অবশেষে পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপে আসিলেন। সেখানে বহু বড় বড় পণ্ডিত ছিল, তাঁহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া সকলের টিকি কাটা গেল। এবার সমস্ত দেশ জয় করিয়া তিনি দেশে ফিরিতেছিলেন ; এমন সময় খবর পাইলেন কি চাই, পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে অনেক বড় বড় পণ্ডিত। তাহাদের না হারাইতে পারিলে তাঁহার দিগ্‌বিজয় সম্পূর্ণ হইবে না।

নবদ্বীপ হইতে নৌকা করিয়া শিষ্য-সেবক সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় বিক্রমপুর রওয়ানা হইলেন। তাঁহার আগে-পিছে আট-দশখানা নৌকা ভরা টিকি বোঝাই। এতদিন যেখানে যত পণ্ডিতের টিকি কাটিয়াছেন, সব বস্তায় পুরিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন।

দুই তিনখানা নৌকায় পণ্ডিতের শিষ্যেরা বসিয়া বসিযা বিক্রমপুরের পণ্ডিতদের টিকি কাটিবার আশায় কাঁচিতে ধার দিতেছে,ঘচা ঘচ্চং– ঘচা ঘচ্চং।

এই দিগ্‌বিজযী পণ্ডিতের নৌকা যখন বিক্রমপুরের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল তখন সেখানকার পণ্ডিতসমাজের মধ্যে হায়! হায়! রব পড়িয়া গেল।

বিক্রমপুরের পণ্ডিতদের বড় বড় টিকি। কারো দশ হাতী টিকি, কারো বিশ হাতী টিকি, কারো বা চল্লিশ হাতী টিকি।

সেই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে তাহাদের একে একে তর্কযুক্ত আরম্ভ হইল। প্রথম দশ হাতী পণ্ডিতের টিকি কাটা গেল, তারপর বিশ হাতীর, তারপর ত্রিশ হাতীর, তারপর চল্লিশ হাতী পণ্ডিতের পালা। চল্লিশ হাতী পণ্ডিত টিকিতে ভালমতো সরিষার তৈল মালিশ করিয়া সেই দিগ্‌বিজয়ীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আগমন করিলেন। কিন্তু দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন পণ্ডিতের শিষ্যেরা কাঁচি আগাইয়া ঘচা ঘচ্চং করিয়া সেই চল্লিশ হাতী পণ্ডিতের টিকি কাটিতে প্রস্তুত হইল।

পণ্ডিত অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, "তোমরা আজিকার দিনটা সবুর কর। কালকে আমার টিকি কাটিও। আজ আশি বছর ধরিয়া কত সরিষার তৈল মালিশ করিয়া এই টিকি বড় করিয়াছি। নিমন্ত্রণ সভায় কত রসগোল্লা সন্দেশ এই টিকির সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া বাড়ি আসিয়াছি। আজকের রাতটা টিকিটাকে ভালমতো যত্ন করিয়া লই। কাটিতে হয় ত কাল কাটিও।" দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের শিষ্যেরা এই কথায় রাজি হইল।

চল্লিশ হাতী পণ্ডিত বাড়িতে আসিয়া আপনার জনদের কাছে তার পরাজয়ের সকল কথা বলিলেন। বাড়ির সকলে মিলিয়া পণ্ডিতের এই চল্লিশ হাতী টিকি ধরিয়া সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাল সকালে এই টিকি কাটা যাইবে। ইহাতে কি পণ্ডিত মহাশয়ের যে-সে ক্ষতি হইবে? দেশে নিয়ম ছিল, প্রত্যেক নিমন্ত্রণে ভূরিভোজনের পরে যে পণ্ডিতের যত হাত টিকি, সে ততটা করিয়া সন্দেশ রসগোল্লা আর পানতোয়া বাড়িতে লইয়া আসিতে পারিবে। কাল যদি এই টিকি কাটা যায়, তবে নিমন্ত্রণ বাড়ি হইতে ভবিষ্যতে আর কিছুই আসিবে না। পণ্ডিতের বউ বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, পণ্ডিতের ছেলেমেয়েরা হাউমাউ করিয়া কান্দে।

বাড়িতে ছিল একটি নমঃশূদ্র চাকর। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এরূপ কান্নাকাটি করিতেছেন কেন ?" পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার সকল দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "কাল হইতে আর আমি তোমাকে রাখিতে পারিব না। টিকি যদি কাটা যায় আমার আর আয় থাকিবে না। কি করিয়া তোমাকে বেতন দিব ?"

নমঃশূদ্র চাকরটি সমস্ত শুনিয়া বলিল, "আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একবার এই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে যাইয়া বিচার করিয়া আসিতে পারি। আপনি শুধু আপনার পৈতাগাছা আমাকে দিবেন।"

পণ্ডিত মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া বলিলেন, "এত বড় বড় পণ্ডিত হারিয়া আসিল, আর তুমি যাইবে তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে?" চাকরটি বলিল, "আপনি আমাকে শুধু একগাছা পৈতা দেন। আমি হারিলে ত আপনাদের কোনো ক্ষতি নাই। যদি জিতি তাহা হইলে সকলেরই ভাল।"

পণ্ডিতের বউ বলিলেন, "দাও একে একগাছা পৈতা। পচা শামুকেও তো পা কাটে। দেখি ও কি করে।"

পরের দিন সকালবেলা পৈতা গলায় ঝুলাইয়া, চান্দিতে পাট দিয়া হাত পঞ্চাশেক একটি নকল টিকি লাগাইয়া, তাহাতে হাঁড়ি-পাতিলের কালি লাগাইয়া চাকরটি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সামনে যাইয়া উপস্থিত হইল।

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, "হাতি ঘোড়া হল তল, মশা বলে কত জল। এত এত পণ্ডিত আমার সঙ্গে পারিল না, আর তুমি ছেলেমানুষ আসিয়াছ বিচার করিতে। মানে মানে বাড়ি চলিয়া যাও।"

চাকর বলিল, "অল্প বয়স বলিয়া আমাকে হেলা করিবেন না। এতটুকুন আগুনের ফুলকিতে সারা গ্রাম পুড়িয়া যায়। এতটুকু কাঁটাটা ফুটিলে হাতিও পা পিছড়াইয়া পড়িয়া যায়, এতটুকুন বড়শি দিয়া কত বড় বড় মাছ ধরিয়া আনে।"

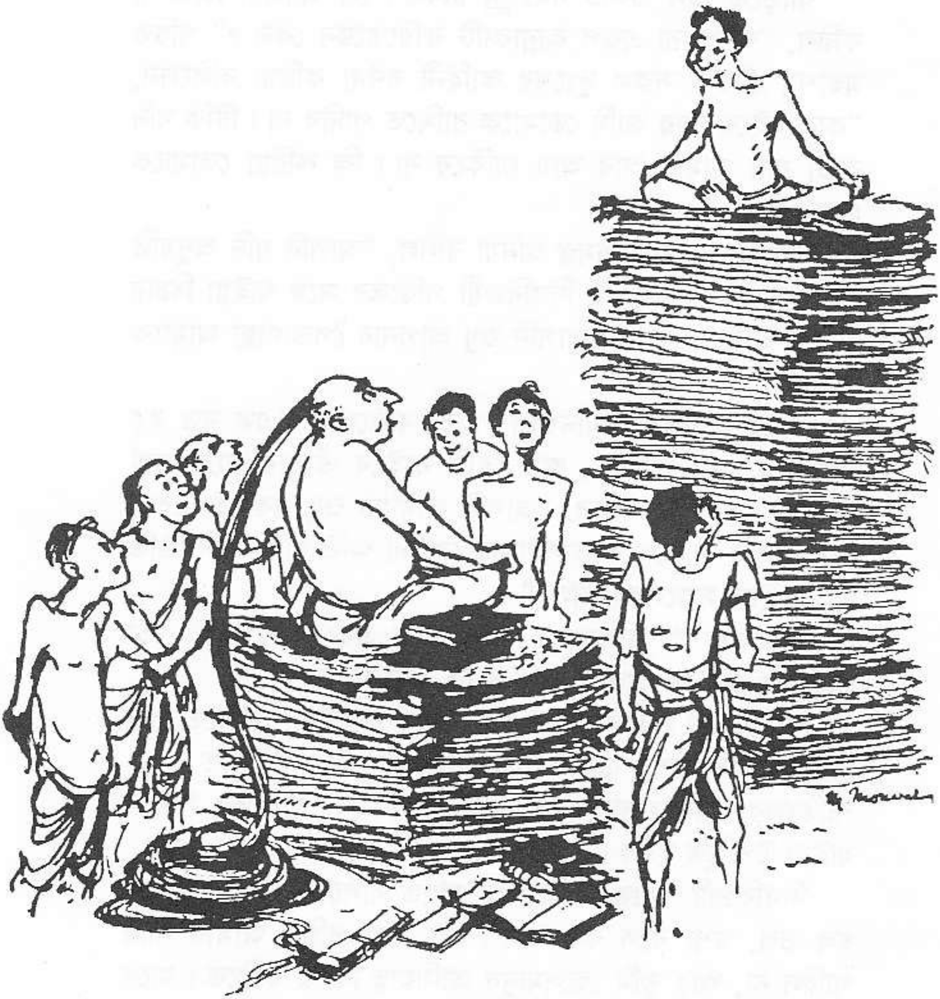

দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন, "ছোকরা! তুমি ত ডেঁপো হইয়া উঠিয়াছ। আচ্ছা, আমাকে প্রশ্ন কর।'

ছোকরা চাকর বলিল, "আপনিই আগে আমাকে প্রশ্ন করুন।"

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত তোমার কত চাটাই ?"

চাকরটি পাল্টা জবাব দিয়া বলিল, "আপনার কত চাটাই তাই আগে বলুন।"

দিগ্‌বিজয়ী উত্তর করিলেন, "আমার একশ চাটাই।"

চাকর বলিল, "আমার পাঁচশ চাটাই।"

দিগ্‌বিজয়ী তখন একশত চাটাইর উপর বসিলেন। চাকর বসিল তার চাইতে উঁচু জায়গায় পাঁচশত চাটাইর উপর।

দিগ্‌বিজয়ী এবার চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে প্রশ্ন কর।"

চাকর বলিল, 'আপনিই আগে আমাকে প্রশ্ন করুন।" দিগ্‌বিজয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল ত লাউয়া ফলং মানে কি ?"

চাকর তখন পাঁচশ চাটাইর উপর হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া দিগ্‌বিজয়ীর টিকি ধরিয়া বলিল, "আরে মূর্খ! আগেই লাউয়া ফলং কিরে। প্রথমে বীজ রোপণং করন্তি, তার পরে অঙ্কুর হইতে গাছং হন্তি, গাছ জাংলাং বান্তি, গাছে ফুলং হন্তি তার পরে ত লাউয়া ফলং। অর্থাৎ কিনা, প্রথমে বীজ রোপণ করিতে হইবে। তারপর বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিবে, তাহা হইতে গাছ, গাছ আবার জাংলা বাহিলে তাহা হইতে ফুল ধরিবে, এই ফুল হইতে লাউ ফল ধরিবে।"

এতবড় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছোকরা চাকরের কাছে হারিয়া গেল। ছোকরা তখন তার টিকিটি কাটিয়া লাফাইতে লাফাইতে বাড়ি আসিল।

পরের দিন বিক্রমপুরে সকলে মিলিয়া দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সেই টিকিগাছা লইয়া রাস্তায় রাস্তায় নগর সংকীর্তন করিয়া বেড়াইল।

টিকিশূন্য দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত লজ্জায় দেশে ফিরিয়া গেল।

তিন মুসাফির

আগেকার দিনে একদল লোকে দেশে দেশে মুসাফিরী করিয়া বেড়াইত। নানা জায়গায় ঘুরিয়া তাহারা সকল দেশের রীতিনীতি জানিয়া বইপুস্তক লিখিত। তাহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি, সকলেই থাকিত। ভিন্ন জাতের বলিয়া কেহ কাহাকেও অবহেলা করিত না।

এমনি তিন মুসাফির বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। এক ইহুদি, এক খ্রিস্টান, আর এক মুসলমান। সেদিন তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে এক নূতন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পথ চলিয়া তাহারা যেমনই হয়রান, তেমনই ক্ষুধায় কাতর। কিন্তু তখন অনেক রাত্র হইয়াছে। গৃহস্থেরা সকলে ঘরদোর বন্ধ করিয়া ঘুমইয়া পড়িয়াছে। না পাইল তাহারা আহার— না পাইল থাকিবার জায়গা! একটা বটগাছের তলায় কম্বল বিছাইয়া তাহারা শুইবার জোগাড় করিল।

এমন সময় একটি লোক সামান্য কিছু মিঠাই আনিয়া তাহাদের উপহার দিল। তিনজনেরই এত ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, এই সামান্য মিঠাই ভাগ করিয়া খাইলে তাহাদের কাহারও পেট ভরিবে না। ক্ষুধার সময় সামান্য কিছু খাইলে ক্ষুধা আরও বাড়ে। তাই তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "এসো ভাই! আমরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যে সবচাইতে ভাল

স্বপ্ন দেখিবে, সে-ই মিঠাই খইবে।" একথা সকলেই মানিয়া লইল। তাহারা যার যার বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন ছিল রমজান মাস। শেষরাত্রে মুসলমান মুসাফির সেহেরি খাওয়ার ঘোষণা শুনিয়াই জাগিয়া উঠিল।— জাগিয়া উঠিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া সমস্ত মিঠাই খাইয়া ফেলিল, আর মিঠাই-এর পাত্রটি রুমাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিল।

ইহার মধ্যে ভোর হইয়াছে। খ্রিস্টান আর ইহুদিও আড়ামোড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কে কেমন স্বপ্ন দেখিয়াছে। প্রথমে খ্রিস্টান বলিতে আরম্ভ করিল, "আরে, ভাই, আমি যে কি মজার স্বপ্ন দেখিয়াছি!"

ইহুদি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কি দেখিয়াছ, ভাই ?"

খ্রিস্টান বলিতে লাগিল, "দেখিলাম, আমি যেন আকাশে উড়িতে উড়িতে সেই চৌঠা আসমানের উপর যাইয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে ঈশা নবী আমার হাতটি ধরিয়া কত কথাই না বলিলেন!"

ইহুদি বলিল, "আমি ভাই আরও ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছি! কোথাকার একটা ময়ূর আসিয়া আমাকে তাহার পাখায় বসাইয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। তারপর নানা দেশ ঘুরাইয়া আমাকে সেই কোহেতুর পাহাড়ে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে দাঁড়াইয়া আমি আল্লার সঙ্গে কথা বলিলাম।" এরপর তাহারা মুসলমান মোসাফিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এবার তোমার স্বপ্ন বল ভাই।"

মিঠাই খাওয়ার একটা লম্বা ঢেকুর তুলিয়া এবার মুসলমান মুসাফির আরম্ভ করিল, "আমার স্বপ্নটা ভাই বড়ই খারাপ।"

ইহুদি আর খ্রিস্টান খুশি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলিয়াই ফেল না ভাই, কেমন স্বপ্ন দেখিলে!"

মুসলমান কহিল, "আমি ভাই, দেখিলাম, কোথাকার এক ভীষণ দৈত্য আসিয়া আমার ঘাড় ধরিয়া বলিল, "জলদি মিঠাই খাইয়া ফেল্— নতুবা তোকে গলা টিপিয়া মারিব। আমি আর কি করিব, তাড়াতাড়ি সবটা মিঠাই খাইয়া ফেলিলাম।" এই বলিয়া রুমালের ঢাকনি সরাইয়া মিঠাই-এর খালি পাত্রটা দেখাইয়া দিল।

ইহুদি আর খ্রিস্টান তখন একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ভাই, আমাদের ডাকিলে না কেন ? আমরা উঠিয়া দৈত্যটাকে তাড়াইয়া দিতাম।"

মুসলমান বলিল, "ডাক কি কম দিলাম ভাই! কত জোরে জোরে তোমাদের ডাকিলাম।"

তারা দুইজন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আমরা ত নিকটেই ছিলাম ; তবে শুনিলাম না কেন ?"

মুসলমান বলিল, "কি করিয়া শুনিবে ভাই! তোমাদের একজন রহিলে সেই চৌঠা আসমানের উপরে, আর একজন রহিলে সেই অত দূরে কোহেতুর পাহাড়ের উপরে। আমার ডাক অত দূরে যাইবে কি করিয়া ?"

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বোকার বাণিজ্য

এক ছিল তাঁতি। ঘরে বসিয়া কাপড় বোনে। বেপারীরা আসিয়া তাহাকে ঠকাইয়া কম দামে কাপড় কিনিয়া লইয়া যায়। তার বউ তাকে পরামর্শ দিল, "তুমি হাটে যাইয়া কেন কাপড় বেচ না ?"

পরামর্শটি তাঁতির খুব পছন্দ হইল। সে নৌকাখানা ভালমতো সেঁচিয়া বড় একটা লম্বা দড়ি দিয়া ঘাটে বাঁধিয়া রাখিল। রাত্র হইলে কাপড়ের বোঝা নৌকায় রাখিয়া তাঁতি নৌকার দড়ি না খুলিয়াই নৌকা বাহিতে আরম্ভ করিল। নদীতে ছিল খুব স্রোত। তাঁতি খানিক নৌকা বাহিয়া আগাইয়া যায়, আবার স্রোত তাহাকে পিছাইয়া আনে। এইভাবে সারারাত্র নৌকা বাহিয়া সে একটুকুও আগাইতে পারিল না। তাহার কিন্তু মনে হইল, সে নৌকা বাহিয়া অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে।

সকালবেলা তাঁতির বউ নদীতে পানি লইতে আসিয়াছে। তাঁতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "মা লক্ষ্মী! বলিতে পার এটা কোন ঘাট ?" তাঁতীর বউ তাকে চিনিতে পারিয়াছে। বউকে মা বলা খুবই খারাপ। সে ঝাঁটা তুলিয়া তাঁতিকে মারিতে আসে। "মিনসে বলে কি।" অল্পক্ষণে তাঁতি তার বউকে চিনিতে পারিল।

তাঁতি বলে, "আচ্ছা আমার হইল কি ? সারারাত্র নৌকা বাহিলাম, কিন্তু নিজের ঘাট হইতে এক ইঞ্চিও আগাইয়াও যাইতে পারিলাম না!"

বউ আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "নৌকা যে বাহিলে, নৌকার দড়ি খুলিয়াছিলে ? নৌকা ত খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে।"

তাঁতি বলিল, "তাই ত, বড় ভুল হইয়াছে।"

তুমাভি কাঁঠাল খায়া

এক কাবুলিওয়ালা বাঙলাদেশে নূতন আসিয়াছে! বাজারে যাইয়া দেখে বড় বড় কাঁঠাল বিক্রি হইতেছে। পাকা কাঁঠালের কেমন সুবাস ! নাজানি খাইতে কত মিষ্টি! তাহার দেশে ত এত বড় ফল পাওয়া যায় না। মাত্র আট আনা দিয়া মস্ত বড় একটা কাঁঠাল সে কিনিয়া ফেলিল। কাঁঠালটি লইয়া সে একবার ঘ্রাণ শুঁকিয়া দেখে, আবার কাঁধে লইয়া দেখে। তারপর খুশিতে নাচিতে নাচিতে কাঁঠালটি বাসায় লইয়া গেল।

আমরা জানি, কাঁঠাল খাইতে হইলে হাতে তেল মাখাইয়া লইতে হয়, ঠোঁটে তেল লাগাইয়া লইতে হয়। তাহা না করিলে কাঁঠালের আঠা হাতে মুখে লাগিয়া যায়। সাবান পানি দিয়া কিছুতেই তোলা যায় না।

কাবুলিওয়ালা নূতন লোক। এসব কিছুই জানে না। সে দুই হাতে কাঁঠালটি ধরিয়া কামড়াইতে লাগিল। কাঁঠালের আঠা তাহার হাতে লাগিল, মুখে লাগিল, দাড়িতে লাগিয়াই দাড়ি জট পাকাইয়া গেল ; কিন্তু সেদিকে কে খেয়াল করে! এমন মিষ্টি কাঁঠাল আর এমন তার খোশবু! সে ছোবড়াসমেত সমস্ত কাঁঠালটি খাইয়া ফেলিল। তারপর হাতমুখ ধুইতে যাইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। সাবান ঘষিয়া, সোডার পানি গোলাইয়া সে হাত আর দাড়ি যতই পরিষ্কার করিতে যায়, ততই হাতে-মুখে, দাড়িতে কাঁঠালের আঠা আরও চটচট করে।

রাত্রে শুইতে যাইয়া আরও মুশকিল। এপাশ হইতে ওপাশ ফিরিতে বিছানা বালিশে দাড়ি অটকাইয়া চটচট করিয়া তাহাতে কিছু দাড়ি ছেঁড়া যায়। দাড়িতে হাত বুলাইতে হাত দাড়ির সঙ্গে আটকাইয়া যায়। তাহাতে কিছু দাড়ি ছেঁড়া যায়! সারারাত সে ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন হাটের বার। এটা ওটা কিনিতে সে হাটে গিয়াছে। তরকারির দোকানে তরকারি দর করিতে, ঝিঙ্গা-পটল দাড়ির সঙ্গে আটকাইয়া আসে, মাছের দোকানে মাছ তার দাড়িতে আটকাইয়া আসে। দোকানিরা দাড়ি হইতে সেগুলি ছাড়াইয়া লইতে দাড়ি চটচট করিয়া ছেঁড়ে। বেচারি কি আর করে ! মনের দুঃখে কিছু না কিনিয়াই বাসায় ফিরিয়া আসিতে চায়।

তাও কি ফিরিয়া আসিতে পারে ? দাড়ির সঙ্গে ওর ছাতা আটকাইয়া যায়— তার গামছা আটকাইয়া যায়। সকলে তাহাকে ধরিয়া মারিতে আসে।

মনের দুঃখে বেচারা এক যুবকের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ বাবুজি! হামি ত কাঁঠাল খাইছে। কাঁঠালের আঠা

হামার দাড়িমে আর গোঁফমে লাগ গিয়া। কিছিছে ছেড়তা নেহি। আব ক্যা করেংগা সাব ?"

যুবকটি দেখিল বেশ মজা হইয়াছে! সে আরও মজা দেখিবার জন্য বলিল, "আপনি দাড়িতে কিছু ছাই লইয়া মাখান, আঠা ছাড়িয়া যাইবে।"

কাবুলিওয়ালা বাসায় যাইয়া তাহাই করিল। ছাই মাখানের ফলে তাহার দাড়িতে কাঁঠালের আঠা আরও জট পাকাইয়া গেল। মুখের চেহারা বদ হইয়া পড়িল। কাবুলিওয়ালা কি আর করে— খাইতে গেলে হাত দাড়িতে লাগিয়া আটকাইয়া যায়, শুইতে গেলে বিছানা-বালিশের সঙ্গে দাড়ি জড়াইয়া যায়। এপাশ ওপাশ হইতে দাড়ি চট চট করিয়া ছেঁড়ে। অবশেষে সে একজন বৃদ্ধ লোকের কাছে যাইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল।

"য়্যা বাবুজি। হামি ত কাঁঠাল খাইছে। আওর কাঁঠাল কা আঠা হামার দাড়িমে গোঁফমে লাগ গিয়া! এক যোয়ান কা পরামর্শমে উছকা পর হাম ছাই লাগায়ে দিয়া। এসিসে এ দাড়িমে জট পাকায়া, আভি হাম ক্যা করেংগা ?"

সমস্ত শুনিয়া বৃদ্ধ লোকটি বলিলেন, "সাহেব! একে ত কাঁঠালের আঠা তোমার দাড়িতে লাগিয়াছে, তার উপরে মাখাইয়াছ ঘুঁটের ছাই। এর উপরে আর কোনো কেরামতিই খাটিবে না। তুমি এক কাজ কর, নাপিতের কাছে যাইয়া গোঁফদাড়ি কামাইয়া ফেল।"

কতকাল ধরিয়া কাবুলিওয়ালা তাহার মুখের এই দাড়ি জন্মাইয়াছে। গাড়িতে ইষ্টিমারে এই দাড়ি দেখিয়া লোকে তাহাকে কত খাতির করে। নিমন্ত্রণ বাড়িতে এই দাড়ি দেখিয়া লোকে তাহার পাতে আরও দুইটা বেশি করিয়া রসগোল্লা-সন্দেশ আনিয়া দেয়। আজ সেই দাড়ি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। মনের দুঃখে কাবুলিওয়ালা অনেকক্ষণ কাঁদিল। কিন্তু কাঁদিয়া কি হইবে ? নিরুপায় হইয়া সে এক নাপিতের কাছে যাইয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া ফেলিল।

তার দুঃখের ভাগী আর কে হইবে। হাটে-পথে, মাঠে-ঘাটে সে যখন যাহাকে দাড়ি কামানো দেখে, তারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "ভায়া হে! তুমভি কাঁঠাল খায়া ?"

সে মনে করে, যাহাদের দাড়ি নাই, তাহারও বুঝি কাঁঠাল খাইতে কাঁঠালের আঠা দাড়িতে লাগাইয়া তাহারই মতো দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছে।

সেরটা কত বড়

তাঁতি আর তাঁতির বউ। সারাদিন তাঁত খট্ খট্, চরকা ঘড় ঘড়। সকাল হইতে সন্ধ্যা এদের কাজের বিরাম নাই। কিন্তু এত কাজ করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। তাঁতের কাপড় বিক্রি করিয়া অতি সামান্যই তাহারা আয় করে।

একদিন তাঁতির বউ তাঁতিকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, আমাদের বাড়ির কাছে চাষীরা কত সুখে আছে। তাদের ক্ষেতে ধান হয়, কাউন হয়, আরও কত রকমের ফসল হয়। এসব দিয়া গেরস্ত বউরা বারোমাসে তের রকমের পিঠা করে!

তুমি এক কাজ কর। এই তাঁত-খুটি বেচিয়া বাজার হইতে বীজধান কিনিয়া আন। আমাদের বাড়ির কাছের ওই জমিটায় আমরা ধান বুনিয়া দিব।

তাঁতি বলিল, "বউ। তুই খুব ভাল পরামর্শ দিয়াছিস! আমাদের ক্ষেতে যখন ধান হইবে, তখন কি মজাই না হইবে! নতুন ধান ভানিয়া তুই কি কি পিঠা বানাইবি ?"

তাঁতির বউ বলে, "চিতই পিঠা, পাঠিসাপটা পিঠা, বড়া পিঠা।" শুনিয়া তাঁতির জিহ্বায় পানি আসে আর কি ! বল ত খোকাখুকুরা, তাঁতির বউ আর কি কি পিঠা বানাইবে ? যে আগে বলিতে পারিবে তারই জিত।

মহাউৎসাহে তাঁতি তার তাঁত-খুটি মাথায় করিয়া হাটে চলিল। অনেক দরদস্তুর করিয়া সে পাঁচসিকাতে সেই তাঁত-খুটি বিক্রি করিল। তারপর যাকে দেখে তাকেই জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কাছে বীজধান আছে ?"

বেনেতি দোকানে, ওষুধের দোকানে যাইয়া সে জিজ্ঞাসা করে, "পাঁচসিকার বীজধান দিতে পার ভাই ?

সবাই ঠাট্টা করিয়া তাঁতিকে তাড়াইয়া দেয়। বীজধান ত আর যেখানে সেখানে যার তার কাছে পাওয়া যায় না।

আগেকার দিনে হাটে বাজারে দু'একজন ট্যাটন থাকিত। লোক ঠকাইয়া তাহারা টাকা-পয়সা উপার্জন করিত। তাঁতি এমনই এক ট্যাটনের কাছে বীজধানের খোঁজ করিতেই সে তাঁতিকে খুব আদর করিয়া হাটের বাহিরে একটি চষা ক্ষেতের কাছে লইয়া গেল।

চাষীরা চষা ক্ষেত হইতে ঘাসের শিকড়-বাকড় কুড়াইয়া এক জায়গায় জড়ো করিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া আগুন দিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে। তাহাতে সেই শিকড়-বাকড়গুলি হইতে ঘাসের চারা গজাইবে না।

সেই চালাক ট্যাটন বোকা তাঁতির নিকট হইতে পাঁচসিকা দাম লইয়া একবস্তা ঘাসের শিকড়-বাকড় বিক্রি করিল। আর

বলিয়া দিল, "তোমার জমিটা খুব ভাল করিয়া চষিয়া এগুলি বুনিয়া দিও। খুব ভাল ফসল হইবে।"

মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে তাঁতি সেই শিকড়-বাকড়ের বস্তা মাথায় করিয়া বাড়ি ফিরিল।

পরদিন সকাল না হইতেই তাঁতি আর তার বউ কোদাল লইয়া তাহাদের বাড়ির সামনের জায়গাটি কোপাইতে লাগিল। তাহাদের ত গরু নাই যে জমি চষিয়া লইবে।

তাঁতি আর তার বউ। তারা তাঁত চালাইতে জানে, চরকা ঘুরাইতে পারে, কিন্তু জমি কোপাইতে তাহারা বড়ই হয়রান হইয়া পড়িল। অপটু হাতে কোদাল চলে না। তাঁতি মাটিতে এক কোপ মারিয়া হাঁপাইয়া পড়ে, তাঁতির বউ কোদাল লইয়া মাটিতে আর এক কোপ দিয়া শুইয়া পড়ে। তাঁতি গামছা দিয়া বাতাস করিয়া তাকে সুস্থ করে। আবার তাঁতি কোদাল লইয়া মাটিতে দুই তিন কোপ দিয়া হয়রান হইয়া পড়ে, তাঁতির বউ তার কপালে তেল মালিশ করে, হাত পা টিপিয়া দেয়।

এইভাবে প্রায় একমাস পরিশ্রম করিয়া বাড়ির সামনের জমিটুকু তারা কোপাইয়া শেষ করিল। শুধু কি কোপাইল ? জমিতে ঘাসের শিকড়-বাকড় যা কিছু ছিল সব বাছিয়া ক্ষেতের এক পাশে জড়ো করিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে তারা হাট হইতে কেনা সেই ঘাসের শিকড়-বাকড় ক্ষেতের মধ্যে ছড়াইয়া দিল। তারপর তাঁতি আর তার বউ প্রতিদিন সকালে বিকালে সেই জমিতে কলসি কলসি পানি আনিয়া ঢালিতে লাগিল।

একে ত ঘাসের শিকড়-বাকড়, তার উপর এত যত্ন! কয়েক দিনের ভিতরে কালো মেঘের মতো করিয়া তাঁতির ক্ষেতখানি নতুন নতুন ঘাসের চারায় ভরিয়া গেল। দেখিয়া তাদের কি আনন্দ ! তাহারা আরও যত্ন করিয়া ক্ষেতে পানি ঢালিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যেই সেই ক্ষেতের ঘাস বুক সমান উঁচু হইয়া উঠিল। তাঁতি আর তার বউ মনের খুশিতে সেই ক্ষেতের চার পাশ ঘুরিয়া নাচে আর গান করে। ভোর হইতেই তাঁতি ছুটিয়া আসে তার ক্ষেত দেখিতে।

সেদিন অসিয়া দেখে কি, কার যেন গরু আসিয়া ক্ষেতের ধান খাইয়া গিয়াছে। সারাদিন অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়া তাঁতি রাত্র জাগিয়া ক্ষেত পাহারা দিতে লাগিল।

রাত যখন ভোর হয়-হয়, এমন সময় তাঁতি দেখে কি, কার যেন একটা গরু আসিয়া তার ক্ষেতের ধান খাইতেছে। তাঁতি তাড়াতাড়ি যাইয়া গরুটির লেজ ধরিয়া ফেলিল।

গরুটি তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। উড়িতে উড়িতে মুনিঠাকুরের আথালে যাইয়া পৌছিল। তাঁতি ত গরুর লেজ ধরিয়াই আছে।

সেই গরুটি ছিল আকাশের মুনিঠাকুরের। সকালবেলা দোহাইতে আসিয়া মুনিঠাকুর দেখেন, তাঁর গরুর লেজ ধরিয়া একটি মানুষ। মুনিঠাকুরকে দেখিয়া, তাঁতি তেড়িয়া-বেড়িয়া বলিল, "আপনার কি আক্কেল ? আমি গরিব মানুষ! আপনার গরু ছাড়িয়া দিয়া আমার ক্ষেতের ধান খাওয়ান!"

তাঁতির প্রতি মুনিঠাকুরের দয়া হইল। মুনিঠাকুর তাঁতিকে দুই সের চাউল দিয়া বলিলেন, "এই চাউল লইয়া গিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। সেই হাঁড়ি হইতে যত চাউল লইবে হাঁড়ির চাউল ফুরাইবে না! কিন্তু সাবধান! হাঁড়ির চাউল যদি কাউকে ধার দিবে, তবে কিন্তু চাউল আর বাড়িবে না। আমার গরুকে তোমার ক্ষেতে যাইতে দিও। তাকে ঘাস খাইতে বাধা দিও না।"

সন্ধ্যা হইলে মুনিঠাকুরের দেওয়া সেই চাউল গামছায় বাঁধিয়া গরুর লেজ ধরিয়া তাঁতি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাঁতির বউ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁতির নিকট হইতে সমস্ত খবর শুনিল।

তারপর প্রতিদিন সেই হাঁড়ি হইতে চাউল লইয়া তাঁতি আর তাঁতির বউ ভাত রাঁধিয়া পেট ভরিয়া খায়। মনের আনন্দে

তাঁতির বউ পিঠা তৈরি করে। আজ এ পিঠা, কাল সে পিঠা ; অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের নাদুসনুদুস চেহারা হইয়া উঠিল।

বাড়ির কাছে এক গেরস্তের বউ। সে বলে, "দেখরে, তাঁতির বউ রোজ আসিত আমার কাছে এটা ওটা ধার করিতে, ভাতের ফেন লইয়া যাইতে ; কিন্তু আজ একমাসের মধ্যে তাঁতির বউ আমাদের বাড়িতে আসে না। ওদের চেহারাও ত বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিয়াছে। না-খাওয়া মানুষের মতো লাগে না। ইহার কারণ কি ?"

গেরস্ত-বউ তাঁতির বাড়িতে আসিল। তাঁতি যদিও বউকে বারণ করিয়া দিয়াছিল, মুনিঠাকুরের ব্যাপারটা কাউকে না বলিতে কিন্তু তাঁতির বউ এত বড় ঘটনাটা কি করিয়া পেটে হজম করিতে পারে! আজ গেরস্ত-বউকে কাছে পাইয়া একথা ওকথার পরে সে মুনিঠাকুরের ব্যাপারটা সব খুলিয়া বলিল।

অনেকক্ষণ গালগল্প করিয়া তাঁতির বউ গেরস্তের বউকে বলিল, "একটা কথা, আমাদের কাছে কোনোদিন চাউল ধার নিতে আসিবে না ; যদি কাউকে চাউল ধার দেই, তবে আর হাঁড়ির চাউল বাড়িবে না।"

পরের ভাল কে দেখিতে পারে ? তাঁতিদের এই উন্নতি দেখিয়া গেরস্তের বউ ত হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। সে পরদিন আসিয়া বলিল, "বলি বুবু! আমাকে এক সের চাউল ধার দাও।"

তাঁতি-বউ বলিল, "না, তা দিতে পারিব না। তোমাকে ধার দিলে হাঁড়ির চাউল আর বাড়িবে না।"

গেরস্তের বউ বলিল, "বুবু, তোমার মাথার কিরা, আমাকে এক সের চাউল ধার দাও। চাউল ধার দিলে হাঁড়ির চাউল যে বাড়ে না, ও একটা কথার কথা! হাঁড়ির চাউল নিশ্চয় বাড়িবে। চাউল ধার দিলে হাঁড়ির চাউল বাড়ে কি না একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখ না ?"

তাঁতি-বউর মন গলাইতে বেশিক্ষণ লাগিল না। গেরস্তের বউ তাহার নিকট হইতে এক সের চাউল কর্জ করিয়া বাড়ি ফিরিল।

সন্ধ্যাবেলা তাঁতির বউ রান্না করিতে চাউলের হাঁড়িতে হাত দিয়াছে। হাঁড়িতে একটিও চাউল নাই। হাঁড়িটি লইয়া এদিকে ঘুরায়, ওদিকে ফিরায়, কিন্তু চাউল বাহির হয় না।

তখন ত মাথায় বাড়ি! তাঁতি আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বউকে খুব বকিল। কিন্তু বকিয়া আর কি হইবে! পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা দুইজনেই গরুর লেজ ধরিয়া আবার সেই মুনিঠাকুরের বাড়ি যাইবে।

রাত হইলে মুনিঠাকুরের গরু আসিয়া যেই তাঁতির ক্ষেতে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁতি দৌড়াইয়া যাইয়া গরুর লেজ ধরিয়া ফেলিল। গরু ত তাড়া খাইয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। তাঁতির বউ আসিয়া তাঁতির পা ধরিয়া ফেলিল। গেরস্তের বউ গোপনে ক্ষেতের একপাশে লুকাইয়া ছিল। মুনিঠাকুরের বাড়ি যাইবার জন্য তাহারও বড় ইচ্ছা। সেও যাইয়া তাঁতি-বউর পা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিল। ধীরে ধীরে অনেক উপরের আকাশ দিয়া তাহারা উড়িয়া যাইতে লাগিল।

এত দুরের পথ চলিতে তাঁতি-বউ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সে তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বল ত, মুনিঠাকুর যে সের দিয়া তোমাকে চাউল মাপিয়া দিয়াছিলেন সে সেরটা কত বড় ?" তাঁতি ত বউর উপর আগেই চটা! সে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "তা দিয়া তোমার কি হইবে ?" তাঁতীর বউ কাঁদিয়া কাটিয়া মান অভিমান করিয়া বলিল, "আচ্ছা বল না কত বড় সেরটা।" এবার তাঁতি রাগিয়া মাগিয়া গরুর লেজ হইতে হাত ছাড়িয়া যেই দেখাইতে গিয়াছে "এই এত্ত বড় সেরটা।"

অমনি তাঁতি পড়িল তাঁতি-বউর উপর, তাঁতি-বউ পড়িল গেরস্তের বউর উপর। তিনজন ধপ্পাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

সমানে সমান

ছোট্ট একটা নদী, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। তার পশ্চিম পারে থাকে এক ট্যাটন, নাম ধূলি। পুব পারে থাকে আর এক ট্যাটন। তার নাম বালি। ট্যাটন মানে অতি চালাক। লোক ঠকাইয়া বেড়ানোই তাহার পেশা। বালি এক ছালা বিচেকলার বীজ মাথায় লইয়া নদীর ওপার দিয়া যাইতেছে। পশ্চিম পারের ট্যাটন ধূলি তেমনি আর এক ছালা গাবের পাতা মাথায় করিয়া নদীর এপার দিয়া যাইতেছে। কেউ কাহাকে জানে না।

ধূলি বালিকে ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছালায় কি লইয়া যাইতেছ ?"

বালি উত্তর করিল, "একবস্তা গোলমরিচ লইয়া চলিয়াছি হাটে। তোমার মাথায় কি লইয়া যাইতেছ ভাই ?"

ধূলি বলিল, "এক ছালা তেজপাতা লইয়া চলিয়াছি হাটে।"

দুইজনে নদীর এপার ওপার পথ ধরিয়া চলিতেছে। আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে শান দিতেছে, কি করিয়া একে অপরকে ঠাকইবে। ধূলি ভাবে, যদি আমার গাবের পাতার বস্তা বদল করিয়া ওর গোলমরিচের বস্তা লইতে পারিতাম! বালি ভাবে, যদি আমার কলার বীজের বস্তা বদল করিয়া ওর তেজপাতার বস্তা লইতে পারিতাম! কিন্তু কেউ কাহাকে কিছু বলে না, কেবল মনে মনে নানা ফন্দি ফিকির আঁটে। আর একথা সেকথা বলিয়া এ ওর আপন হইতে চায়।

অনেকক্ষণ পর বালি ধূলিকে বলে, "আচ্ছা ভাই! তোমার সঙ্গে যখন এতই খাতির হইল, আইস আমরা একে অন্যের বোঝা বদলা-বদলি করি।" ধূলি ত তাহাই চায়! সে তাহার

গাবের পাতার বস্তার বদলে যদি গোলমরিচের বস্তা লইতে পারে তবে ত পোয়াবারো।

একটু কাশিয়া সে জবাব দেয়, "আগেকার দিনে রাজপুত্রেরা বন্ধুত্ব করিতে পাগড়ি বদল করিত, এসো ভাই আমাদের বন্ধুত্ব হোক ছালা বদল করিয়া।" দুইজনেই দুইজনের কথায় খুশি।

বালি তাহার কলাবীজের বস্তা বদল করিয়া ধূলির গাবের পাতার বস্তা লইল। এ বলে আমি ওকে ঠকাইয়াছি। ও বলে আমি তাকে ঠকাইয়াছি! সেইজন্য কেউ কারো বস্তা পরীক্ষা করিল না।

বাড়িতে লইয়া গিয়া ধূলি দেখে, তার বস্তা ভরিয়া শুধু বিচেকলার বীজ। একটাও গোলমরিচের দানা নাই। বালিও তেমনি দেখিল, তার বস্তা ভরিয়া শুধু গাবের পাতা। প্রত্যেকে মনে মনে হাসিল, আর এ ওর বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল। কিন্তু দুইজনে মনে মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিল, কি করিয়া একে অপরকে ঠাকইবে।

পরদিন ভোরবেলায় বালি নদীর ওপারে চুলা জ্বালাইয়া তার উপরে এক হাঁড়ি গরম পানি জ্বাল দিতে লাগিল। নদীর এপার হইতে ধূলি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত! কি করিতেছ?" বালি উত্তর করিল, "তোমার সঙ্গে গোলমরিচের বস্তা বদল করিয়া তেজপাতা লইয়া হাটে গিয়াছিলাম। আমার বেশ লাভ হইয়াছে। তাই সকাল সকাল ভাত রান্না করিতেছি।"

ধূলি বলিল, "আমিও ভাই তোমার গোলমরিচ বেচিয়া বেশ কিছু পাইয়াছি। কিন্তু আমার ত চুলা নাই। আমার কাছে কিছু চাউল আছে। তোমার হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দেই। দুইজনে একসঙ্গে ভাত খাইব।"

বালি ভাবিল, "তা মন্দ কি! আমি ত শুধু পানি সিদ্ধ করিতেছি। ও যদি এর মধ্যে কিছু চাউল ছাড়িয়া দেয়, তবে ওর উপর দিয়াই আজিকার সকালের আহারটা সারিয়া লইব।"

প্রকাশ্যে বলিল, "তা বেশ ত তোমার চাউল লইয়া আইস। আমরা একসঙ্গে রান্না করিয়া খাই।"

নদীতে পানি অল্প। হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। এপার হইতে ধূলি আসিয়া সেই উনানের পাশে বসিল। বালি যেই একটু ওদিকে তাকাইয়াছে, অমনি ধূলি তার কাপড়ের এক কানি একটা পোটলার মতো করিয়া ধরিল। যেন ধূলি বুঝিতে পারে, তার মধ্যে চাউল আছে। তারপর বালিকে বলিল, "দেখ— দেখ ভাই। অকাশ দিয়া কেমন একটা পাখি যাইতেছে।"

পুব পারের ট্যাটন একটু চাহিয়াছে, অমনি ধূলি তার কাপড়ের পুটলি খুলিয়া হাঁড়ির মধ্যে চাউল ঢালিতেছে এরূপ ভান করিয়া কাপড় ঝাড়া দিতে লাগিল। তারপর হাঁড়ির মুখে ঢাকনি দিয়া দুইজন চুলায় জ্বাল দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুলায় জ্বাল দিয়া যখন তাহারা ঢাকনি খুলিল, তখন দেখা গেল হাঁড়ির মধ্যে শুধুই গরম পানি সিদ্ধ হইতেছে। একটাও ভাত নাই। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া তাহারা সবই বুঝিতে পারিল।

বালি তখন ধূলিকে বলিল, "দেখ ভাই ! এখন সত্যই বুঝিতে পারিলাম, আমরা কেহ কাহারও চাইতে বুদ্ধিতে কম না। আমাদের এই মূল্যবান বুদ্ধি একে অপরের উপর ছাড়িয়া শুধুই সময় নষ্ট করিতেছি। এসো আমরা সত্যিকার বন্ধু হই। আমাদের দুইজনের বুদ্ধি একসঙ্গে ব্যবহার করিলে আমরা অনেক লাভ করিতে পারিব।"

ধূলি বলিল, "বেশ ভাই! আমি তাহাতে রাজি আছি।"

তখন দুই বন্ধু অনেক পরামর্শ করিয়া এদেশ ছাড়িয়া বহু দূরে আর এক দেশে চলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া শুনিল, এক বিদেশী সওদাগর কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে।

তাহার টাকা-পয়সার অন্ত ছিল না। আত্মীয়-স্বজনেরা তাহা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে।

এক গাছতলায় বসিয়া দুই ট্যাটন নানারকম ফন্দি-ফিকির করিতে লাগিল। তারপর রাত্র হইলে সেই লোকটির কবর খুঁড়িয়া তার মধ্যে ধূলি লুকাইয়া রহিল।

পরদিন সকালবেলায় বালি সেই সওদাগরের বাড়ির সামনে যাইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না শুনিয়া পাড়ার সকলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদ কেন ?"

সে বলিল, "এ বাড়ির সওদাগর সাহেব ছিলেন আমার পিতা। তাঁর মরার খবর শুনিয়া আমি অমুক দেশ হইতে আসিয়াছি। কিন্তু আমার পিতার সমস্ত সম্পত্তি অপরে দখল করিয়া লইয়াছে। আমার জন্য কিছুই রাখে নাই।" এই বলিয়া সে আবার কাঁদিতে লাগিল।

বিদেশী লোক বলিয়া সবারই একটু দয়ার ভাব! আর লোকটি অমন ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে! তাহার কান্না শুনিয়া সকলের চোখে পানি আসিল।

কিন্তু সওদাগরের আত্মীয়-স্বজনেরা বলিল, "ও যে সওদাগরের ছেলে তার প্রমাণ কি ?"

বালি তখন কান্না থামাইয়া বলিল, "আমার পিতা আমাদের দেশে যাইয়া আমার মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তারপর এদেশে আসিয়া আমাদের খবর লন নাই। আমি বিদেশী লোক। প্রমাণ কোথায় পাইব ? মৌলবি সাহেবেরা বলেন, মরা ব্যক্তির জান তার কবরের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। আপনজনের ডাকে তাহারা কখনও কখনও গায়েবি আওয়াজ করিয়া থাকেন। আসুন আপনারা আমার সঙ্গে। বাপজানের কবরের কাছে যাইয়া একবার তাহাকে ডাক দেই। যদি তিনি কথা বলেন, তবে প্রমাণ হইবে আমি তাঁর সত্যিকার ছেলে।"

একথা শুনিয়া সকলেই রাজি হইল। কবরের কাছে আসিয়া বালি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "বাপজানগো! তুমি মরিয়া গিয়াছ। আমাকে কিছু দিয়া যাও নাই। আমি যদি তোমার সত্যিকার ছেলে হই, তবে আমার ডাকে সাড়া দাও।"

গাঁয়ের লোকেরা অবাক হইয়া শুনিল, কবরের ভিতর হইতে গোঁ গোঁ আওয়াজ হইতেছে। বালি তখন বলিল, "বাপজানগো!

তোমার টাকা-পয়সা সকলে ভাগ করিয়া লইয়াছে। আমার কিছুই নাই। আমাকে কিছু দিয়া দাও।"

কবরের ভিতর হইতে ধূলি আওয়াজ করিল, "ও আমার সত্যিকার ছেলে। তোমরা ওকে সাত ছালা টাকা দাও। নতুবা তোমাদের খুব খারাপ হইবে।"

সওদাগরের আত্মীয়-স্বজনেরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বালিকে সাত ছালা টাকা দিয়া দিল। সেই টাকা গনিযা গাঁথিয়া ছালায় পুরিয়া একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া বালি বাড়ি রওয়ানা হইল।

ধূলি কবরের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। একবারও বালি তাহার কথা মনে করিল না। দুপুরবেলায়, যখন কবরের কাছে কোনো জনমানব নাই, সেই সময় ধূলি কবর হইতে উঠিয়া জানিল, বালি আগেভাগেই টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে তখন শহরের দোকান হইতে খুব দামি একজোড়া জরির জুতা কিনিল ; তারপর যে পথ দিয়া বালি গরুর গাড়ি লইয়া গিয়াছিল, তাহারই চাকার দাগ দেখিয়া দৌড়াইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে বালির কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল এবং অন্য পথে ঘুরিয়া দৌড়াইয়া তার খানিকটা সামনে যাইয়া একখানা জরির জুতা পথের মধ্যে রাখিয়া দিল।

তারপর আরও মাইল খানেক যাইয়া অপর জুতাখানা পথের আর এক জায়গায় রাখিয়া দিয়া সে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

বালি গরুর গাড়ি লইয়া যাইতে দেখে পথের মধ্যে একখানা সুন্দর জরির জুতা পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু একখানা জুতা দিয়া কি কাজ হইবে? পরিতে ত পারিবে না! জুতাখানা নাড়িয়া চাড়িয়া সে পথের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

তারপর মাইলখানেক দূরে যাইয়া সে আর একখানা জুতা দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "আগের জুতাখানা যদি সঙ্গে

আনিতাম, তবে ত দুইখানা একত্র করিয়া বেশ পায়ে দিতে পারিতাম। আর এই জুতাখানা আমার পায়েও বেশ লাগসই।" তখন সে গাড়ি থামাইয়া আগের জুতাখানা আনিবার জন্য দৌড় দিল।

ইতিমধ্যে ঝোপের আড়াল হইতে ধূলি আসিয়া গরুর গাড়িতে উঠিয়া টাকাসমেত গাড়িখানা বাড়ির পথে চালাইয়া দিল।

এদিকে বালি দৌড়াইয়া আসিয়া গাড়ির কোনো খোঁজ পাইল না। সে তখন বুঝিতে পারিল, নিশ্চয়ই ইহা ধূলির কাজ। সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ধূলির বাড়ির দিকে ছুটিল।

ধূলি টাকা-পয়সা গনিয়া গাঁথিয়া মাটির তলে পুঁতিয়া শুইবার আয়োজন করিতেছে ; এমন সময় বালি আসিয়া বলিল, "দোস্ত! সবই বুঝিয়াছি। এবার টাকা-পয়সা ভাগ করিবার আয়োজন কর।"

ধূলি বলিল, "দোস্ত। রাত অনেক হইয়াছে। কাল সকালে আসিও। দুইজনে টাকা-পয়সা ভাগ করিয়া লইব।"

সারারাত জাগিয়া ধূলি তার বউয়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করিতে লাগিল, কি করিয়া বালিকে ঠকাইয়া সাত বস্তা টাকাই সে নিজে লইবে।

পরদিন সকালে বালি আসিয়া যখন তার দরজায় ঘা দিল, বউ তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আজ রাত্রে তোমার দোস্ত মারা গিয়াছে। আমি এখন কোথায় যাইবগো!"

বালি বিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত মরিবার আগে টাকা-পয়সার কথা কিছু বলিয়াছে ? সাত ছালা টাকা আমরা কাল লোক ঠকাইয়া আনিয়াছি।"

বউ ত যেন আসমান হইতে পড়িল! "কই, না ত, সাত ছালা টাকা ? আমাদের ঘরে একটা আধলা পয়সা পর্যন্ত নাই। ওগো, আমি কেমন করিয়া বাঁচিবগো। কে আমাকে খাওয়াইবেগো!"

বালি সবই বুঝিল। সে বলিল, "বউ! তুমি কাঁদিও না। আমি তোমাকে বিপদে আপদে দেখিব। আমার দোস্ত যখন মরিয়াই গিয়াছে, আমি তাকে কবর দিয়া আসি।"

এই বলিয়া সে ধূলির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। টানিতে টানিতে তাহাকে কাঁটা গাছের মধ্যে দিয়া লইয়া যায়। ইটা খেতের মধ্যে দিয়া লইয়া যায়। কাঁটার খোঁচায়, ইটের ঘষায় তাহার হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, তবু ধূলি কথা বলে না। কথা বলিলেই ত সাত বস্তা টাকার ভাগ দিতে হইবে!

এমনি করিয়া টানাটানিতে দুপুর গড়াইয়া সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত হইল। কিন্তু তবুও ধূলি কথা বলে না। তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে এক বনের ভিতর। এখন অন্ধকারে বাড়ি ফিরিবারও উপায় নাই। বালি ধূলিকে এক গাছতলায় রাখিয়া, সে নিজে গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

সে পথ দিয়া একদল ডাকাত ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। তাহারা দেখিতে পাইল, গাছের তলায় একটি মড়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া ডাকাতের সর্দার বলিল, "আজ বড় শুভ যাত্রারে ভাই! পথে একটি মড়া দেখিতে পাইলাম।" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; ডাকাতেরা সাত বস্তা টাকা ডাকাতি করিয়া আনিয়াছে।

ফিরিবার সময় তাহারা এই গাছের তলায় আসিয়া টাকা ভাগ করিতে লাগিল। ডাকাতের সর্দার বলিল, "দেখ ভাই! এই মড়া দেখিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমরা এত টাকা পাইলাম। এক কাজ করি, একে আমাদের টাকার একটা ভাগ দেই।" অপর ডাকাত বলিল, "ও ত মরিয়া গিয়াছে, ওকে টাকা দিলে কাল হয়তো অপর কেহ আসিয়া লইয়া যাইবে। ও আর ভোগ করিতে পারিবে না। তার চাইতে এসো ভাই এক কাজ করি, ওকে এখানে কবর খুঁড়িয়া মাটি দিয়া যাই।"

তখন সকল ডাকাত একটি কবর খুঁড়িয়া যেই মড়াটিকে কবরে নামাইয়া দিবে, অমনি ধূলি হাত পা আছড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে। গাছের উপর হইতে বালি তাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়াছে। ভয়ের চোটে টাকা-পয়সা ফেলিয়া সমস্ত ডাকাত দে চম্পট। তখন দুই বন্ধু হাসিতে হাসিতে এ ওর সঙ্গে কোলাকুলি করিল।

তারপর সেই সাত বস্তা টাকা আগের সাত বস্তার সাথে যোগ করিয়া তাহারা সমান সমান ভাগ করিয়া লইল।

ভাগা ভাগি

বাপ মরিয়া গিয়াছে। দুই ভাই পৃথক হইবে। বড়ভাই ছোটভাইকে বলিল, "দেখ্, আমাদের একটিমাত্র গাই আছে, কাটিয়া ত আর দুই ভাগ করা যাইবে না। তুই ছোটভাই। তোকেই গাই'র বড় ভাগটা দেই। তুই গাই'র মুখের দিকটা নে। আর আমি গাই'র লেজের দিকটা লই।"

ছোটভাই ভারি খুশি! বড়ভাই যে তাহাকে ভাল ভাগটা দিয়াছে, সেজন্য সে বড়ভাইয়ের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সে সারাদিন এখান হইতে ওখান হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া গাইকে খাওয়ায়। বড়ভাই রোজ সকালে হাঁড়ি ভরিয়া দুধ দোয়ায়।

সেই দুধ দিয়া ছানা বানায়, ছানা দিয়া রসগোল্লা বানায়, সন্দেশ বানায় আরও কত কি বানায়! বল ত খোকাখুকুরা আর কি কি বানায় ? যে আগে বলিবে তারই জিত।

বড়ভাই ভারি খুশি, "বেশ আমার ছোটভাই। এমনিই ত চাই। এবার বুঝিতে পারিলাম, বাপের সম্পত্তি তুমি ঠিকই রক্ষা করিতে পারিবে। তোমার ভাগে যখন গাইর মুখের দিকটা পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে ভালমতো তাকে খাওয়াইতে হইবে।"

বড়ভাইর তারিফ শুনিয়া ছোটভাই আরও বেশি করিয়া গরুকে ঘাস দেয়। বড়ভাই আরও বেশি করিয়া গরুর দুধ দোয়ায়; আর ছোটভাইকে আরও বেশি করিয়া তারিফ করে।

একজন চালাক লোক একদিন ছোটভাইকে বলিল, "আরে বোকা! তুই গরুর মুখের দিকটা লইয়া, দিনরাত গরুকে ঘাস খাওয়াইয়া মরিতেছিস, আর ওদিকে তোর বড়ভাই মজা করিয়া দুধ দোয়াইয়া লইতেছে।"

ছোটভাইর তখন টনক নড়িল, "তাই ত! কিন্তু এখন ত কিছুই করার উপায় নাই। আমি যে আগেই গরুর মাথার দিকটা রইয়া ফেলিয়াছি। ঘাস আমাকে খাওয়াইতেই হইবে।"

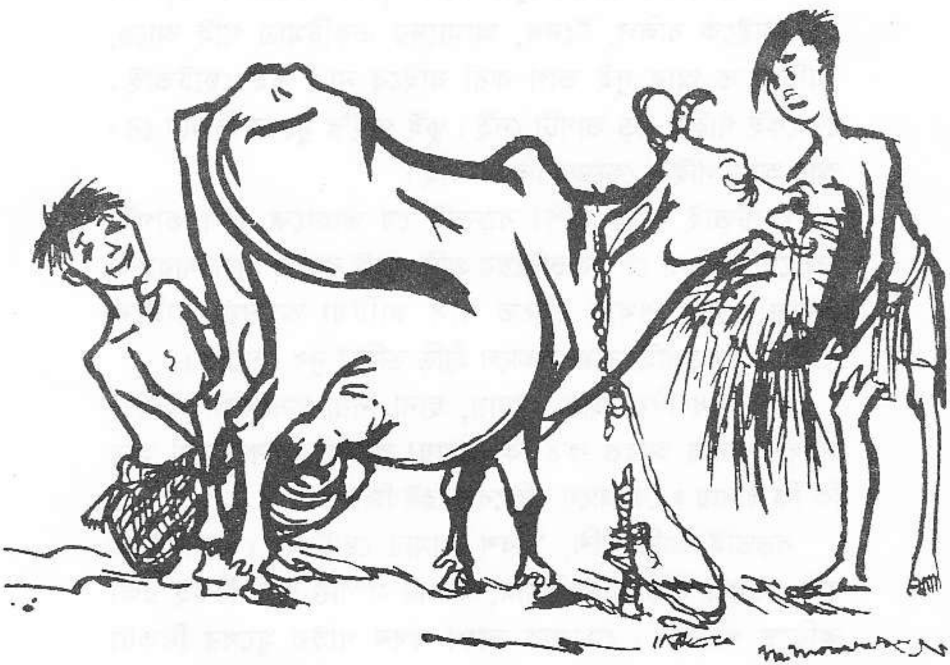

চালাক লোকটি তখন ছোটভাইকে কানে কানে একটি বুদ্ধি দিয়া গেল।

পরদিন সকাল। যেই বড়ভাই গাইর দুধ দোয়াইতে আসিয়াছে, অমনি ছোটভাই গাইর মাথায় একটি মুগুর লইয়া

বাড়ি মারিতে আরম্ভ করিল। মুগুরের ঘায়ে গাই এদিক ওদিক নড়ে। গাই দোয়ানো অসম্ভব। বড়ভাই তখন বলে, "আরে করিস কি ? করিস কি ?"

ছোটভাই উত্তর দেয়, "রোজ আমি গরুকে ঘাস খাওয়াই। দুধ দুইয়া লইয়া যাও তুমি। আমাকে এককোঁটা দুধও দাও না। গরুর মাথার দিকটা যখন আমার, তার উপরে আমি মুগুরই মারি, আর কুড়ালই মারি, তুমি কোনো কথা বলিতে পারিবে না।"

বড়ভাই বুঝিল, কোনো চালাক লোক ছোটভাইকে বুদ্ধি দিয়াছে। সে তখন ছোটভাইকে বলিল "আর তুই গাইর মাথায় মুগুর মারিস না। এখন হইতে গরুর দুধের অর্ধেক তোকে দিব।" ছোটভাই বলিল, "শুধু অর্ধেক দুধ দিলেই চলিবে না, তোমাকে আজ হইতে গরুর জন্য অর্ধেক ঘাসও কাটিতে হইবে। নইলে এই মারিলাম আমি গরুর মাথায় মুগুরের ঘা!"

"আরে রাখ্ রাখ্।" বড়ভাই মুলাম হইয়া বলে, "আজ হইতে অর্ধেক ঘাসও আমি কাটিব!"

বাড়িতে ছিল একটা খেজুর গাছ। শীতকাল, খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করিতে হইবে। বড়ভাই ছোটভাইকে বলে, "আমাদের একটামাত্র খেজুর গাছ। কাটিয়া ত ভাগ করা যায় না। সেরার গরুর মাথার দিকটা লইয়া তুই ঠকিয়াছিলি। এবার বল্ খেজুর গাছের কোন দিকটা নিবি ? গোড়ার দিকটাই বুঝি তোর পছন্দ হইবে।"

ছোটভাই কিছু না ভাবিয়াই উত্তর করে, "আমি খেজুর গাছের গোড়ার দিকটাই লইব।" বড়ভাই খুশি হইয়া বলে, "আচ্ছা তোর কথাই থাক। তুই ছোটভাই, ভাল ভাগটা চাহিলি, আমি বড়ভাই হইয়া ত না করিতে পারি না!"

ছোটভাই লইল খেজুর গাছের গোড়ার দিকটা। সে গাছের গোড়ায় রোজ পানি ঢালে। তাহাতে গাছ আরও তাজা হয়।

বড়ভাই গাছের আগায় হাঁড়ি বসাইয়া মনের আনন্দে রস পাড়িয়া আনে। শীতকালে খেজুরের রস খাইতে কি মজা!

রস দিয়া গুড় তৈরি হয়— গুড় দিয়া চিনি তৈরি হয়, চিনি দিয়া কি কি তৈরি হয় খোকাখুকুরা ? বল বল, যে আগে বলিতে পারিবে তারই জিত।

এইভাবে কিছুদিন যায়। বড়ভাই খেজুরের রস খাইয়া মোটা হইয়া উঠিয়াছে। আর ছোটভাই খেজুর গাছের গোড়ায় পানি ঢালিতে ঢালিতে মাজায় ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছে।

এমন সময় সেই চালাক লোকটি আবার আসিয়া দেখিল ছোটভাই কেমন ঠকিয়াছে। সে তখন ছোটভাইকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিল। ছোটভাই বলিল, "তাই ত, এবারও আমি ঠকিয়াছি। কিন্তু খেজুর গাছের গোড়ার দিকের ভাগ ত আমি নিজেই চাহিয়া লইয়াছি। এর ত আর কোনো প্রতিকার হইবে না।"

"দূর বোকা কোথাকার! বুদ্ধি থাকিলে প্রতিকার হইবে না কেন ?" এই বলিয়া চালাক লোকটি ছোটভাইর কানে কানে আর একটি বুদ্ধি দিয়া গেল। বল ত খোকাখুকুরা, কি বুদ্ধি দিয়া গেল ?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা, যেই বড়ভাই খেজুর গাছে উঠিয়া সেখানে হাঁড়ি পাতিতে গাছের খানিকটা কাটিতেছে, অমনি ছোটভাই একখানা কুড়াল লইয়া খেজুর গাছের গোড়া কাটিতে লাগিল, খপ্-খপ্-খপ্।

বড়ভাই গাছের উপর হইতে শব্দ শুনিয়া বলিল, "আরে করিস কি ? করিস কি ?"

ছোটভাই গাছের গোড়ায় কুড়াল মারিতে মারিতে উত্তর করিল, "তুমি গাছের মাথা লইয়াছ। রোজ গাছের মাথা হইতে রস পাড়িয়া খাও। আমাকে একটু দাও না। আমার যখন গাছের গোড়াটা, সেখানে আমি কুড়াল মারি আর যাই করি তুমি কিছু বলিতে পার না।" এই বলিয়া ছোটভাই আবার গাছের গোড়ায়

কুড়ালের কোপ দিতে আরম্ভ করিল, খপ্‌-খপ্‌-খপ্‌। "আরে থাম্‌–থাম্‌–থাম্‌", বড়ভাই বলে, "আজ হইতে খেজুরের রসও অর্ধেক তোকে দিব।"

দুই ভাই বেশ আছে, গরুর দুধ আর খেজুরের রস দুইজনে সমান সমান ভাগ করিয়া লয়।

তাহাদের বাড়িতে ছিল একখানা মাত্র কাঁথা! বড়ভাই ছোটভাইকে বলে, "দেখ্‌ কাঁথাখানাকে ত ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করা যায় না। তুই কাঁথাখানি দিনের ভাগে তোর কাছে রাখ্‌। আমাকে রাত্র হইলে দিস।"

ছোটভাই খুব খুশি। বড়ভাই দিনের বেলার জন্য কাঁথাখানা তাহাকে দিয়াছে! কিন্তু দিনের বেলা গরম। তখন কাঁথা গায়ে দেওয়া যায় না। সে কাঁথাখানাকে সারাদিন এ ভাঁজ করিয়া ও ভাঁজ করিয়া দেখে। রাত্র হইলে বড়ভাই কাঁথাখানা লইয়া যায়। ছোটভাই সারারাত্র শীতে ঠিরঠির করিয়া কাঁপে। বড়ভাই দিব্যি আরামে কাঁথা গায়ে দিয়া ঘুমায়।

সেই চালাক লোকটি আবার আসিয়া ছোটভাইর অবস্থা দেখিল। দেখিয়া তার কানে কানে আর একটি বুদ্ধি দিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ছোটভাই কাঁথাখানা পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিল। বড়ভাই যখন শুইবার সময় ছোটভাইর কাছে কাঁথা চাহিল, সে তাহাকে ভিজা কাঁথাখানা আনিয়া দিল।

বড়ভাই খুব রাগ করিয়া বলিল, "আরে করিয়াছিস কি ? কাঁথাখানা ভিজাইয়া রাখিয়াছিস ?" ছোটভাই উত্তর করিল, "কাঁথাখানা যখন দিনের ভাগে আমার, তখন সেটা দিয়া আমি দিনের ভাগে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি! তোমার ইহাতে কোনো কথা বলিবার নাই।"

বড়ভাই তখন বলিল, "কাল হইতে আমরা দুই ভাই-ই একত্র কাঁথার তলে শুইব।"

ঠাকুর মশায়ের লাঠি

বামুন ঠাকুর কিছুই আয় করিতে পারে না। পূজা আর্চা করিয়া কিইবা সে পায়। বউ দিনরাত খিটখিট করে, এটা আন নাই—ওটা আন নাই। শুধু কি এমনি খিটিখিটি ? মাঝে মাঝে ঝাঁটা উঁচাইয়া ঠাকুর মশায়কে মারিয়া নাস্তানাবুদ করে। কাঁহাতক আর এত সওয়া যায়! সব সময় বউ বলে, "তুমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাও।"

সেদিন ঠাকুরমশায় বউকে বলিল, "তুমি আমাকে চারখানা রুটি বানাইয়া দাও। আমি বিদেশে যাইব। দেখি কোথাও কোনো কিছু উপার্জন করিতে পারি কি না।"

আপদ বিদায় হইলেই বউ বাঁচে। সে চারিখানা রুটি বানাইয়া দিল। রুটি চারখানা গামছার খোঁটে বাঁধিয়া ঠাকুরমশায় ঘরের বাহির হইল।

যাইতে যাইতে দুপুরের বেলা গড়াইয়া পড়ে, মাথার রোদ পায়ে আসিয়া লাগে। ঠাকুরমশায়ের ক্ষুধা পাইল। সে সামনে একটা ইঁদারার উপর বসিল। বসিয়া গামছার খোঁট হইতে রুটি চারখানা খুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। আর বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "এই চারটার মধ্যে একটা খাই, কি দুইটা খাই ? আমার এত ক্ষুধা পাইয়াছে যে, চারটা খাইলেও পেট ভরিবে না। কিন্তু কাল খাইব কি ?"

সেই ইঁদারার মধ্যে চারজন পরী ছিল। তাহারা ভাবিল, ঠাকুরমশায় বুঝি আমাদের চারজনকেই খাইয়া ফেলিবে।

তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া হাত জোড় করিয়া ঠাকুরমশায়কে বলিল, "আপনি আমাদিগকে খাইবেন না।"

তাহাদের ভয় দেখিয়া ঠাকুরমশায়ের মনে সাহস হইল। সে বলিল, "তবে আমি কি খাইব ? আমার বড্ড ক্ষিধা পাইয়াছে।"

পরীরা নিজেদের মধ্যে একটু আলাপ করিল। তারপর একটি হাঁড়ি আনিয়া বলিল, "এই হাঁড়ি লইয়া যান। ইহার মধ্যে হাত দিলে সন্দেশ রসগোল্লা যা কিছু চাহিবেন পাইবেন।"

হাঁড়ি পাইয়া ঠাকুরমশায় কি খুশি ! প্রথমে সে হাঁড়ির ভিতর হইতে সন্দেশ বাহির করিল,— তারপর রসগোল্লা, তারপর পানতোয়া— তারপর মিহিদানা, আবার খাব, জামাই পিঠা, বউ পিঠা, আরও কত কি? টপাটপ টপাটপ খাইতে খাইতে পেটে যখন আর ধরে না, তখন হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে ঠাকুরমশায় বাড়ির পথে রওয়ানা হইল। কিন্তু বেলা তখন ডুবিয়া গিয়াছে। পথে অন্ধকার। রাত্রে একা একা পথ চলিতে ভয় করে।

সামনে ঠাকুরমশায়ের এক বন্ধুর বাড়ি। সেই বাড়িতে যাইয়া সে অতিথি হইল। মিষ্টির হাঁড়িটি কি করিয়া পাইয়াছে কাউকে তাহা না বলিতে পারিয়া ঠাকুরের দম আটকাইয়া আসিতেছিল। বন্ধুর বউ ঠাকুরমশায়ের জন্য রান্না করিতে যাইতেছিল। সে তাহাকে বলিল, "আজ আর তোমাদের রান্না করিতে হইবে না। আমার নিকট এই যে হাঁড়িটা আছে, উহার মধ্যে হাত দিলে সন্দেশ রসগোল্লা যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে।"

একগাল হাসিয়া বন্ধুর বউ সেই হাঁড়ির মধ্যে হাত দিয়া দেখে, সত্য সত্যই হাঁড়ির কাছে সন্দেশ, রসগোল্লা, যা কিছু চাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। তখন ঠাকুরমশায় আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত এই হাঁড়ি পাওয়ার কাহিনী বন্ধুর বউকে বলিল। তারপর সারাদিনের পরিশ্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

বন্ধুর বউ কিন্তু ঘুমাইল না। সে মিষ্টির হাঁড়িটি সরাইয়া সেখানে সেই হাঁড়িটির মতো, একই মাপের, একই রঙের আর একটি হাঁড়ি আনিয়া রাখিয়া দিল।

সকালে বামুন ঠাকুর উঠিয়া সেই নকল হাঁড়িটি লইয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হইল। কিন্তু পথ কি ফুরাইতে চাহে! কতক্ষণে যাইয়া সে তার বউকে এই হাঁড়ি হইতে মিষ্টি খাওয়াইতে পারিবে?

বাড়ির সামনে যাইয়া ঠাকুর জোরে জোরে তার বউকে বলে, "শিগ্‌গির করিয়া স্নান করিয়া আস।"

বউ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ঠাকুর বলে, "পরে জানিতে পারিবে। তুমি শিগ্‌গির করিয়া স্নান করিয়া আস। এই হাঁড়ির মধ্যে যা কিছু আছে তা পরে জানিতে পারিবে।"

বউ তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিল। ঠাকুরমশায় তখন বলিল, "এই হাঁড়ির মধ্যে হাত দাও। সন্দেশ, রসগোল্লা যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।"

এইটি ত সেই পরীদের দেওয়া সত্যিকার হাঁড়ি নয়। বন্ধুর বউ যে নকল হাঁড়িটি দিয়াছিল ইহা সেইটি। বউ হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়া বলিল, "রসগোল্লা খাইব" কিন্তু হাত শূন্য। বউ আবার হাঁড়ির মধ্যে হাত দিয়া বলিল, "সন্দেশ খাইব" কিন্তু হাত শূন্য। বউ বুঝিল, ঠাকুর তাকে ফাঁকি দিয়াছে।

তখন সে চটিয়া ঠাকুরকে মারিতে আসিল। ঠাকুর কোনোরকমে পালাইয়া বাঁচিল।

পরদিন ঠাকুর বউকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "দেখ, আমাকে আর চারখানা রুটি বানাইয়া দাও। আমি সত্য সত্যই এক হাঁড়ি সন্দেশ লইয়া আসিব।"

ঠাকুরের বউ হাঁড়ি পাতিল নাড়িয়া চাড়িয়া, সামান্য কিছু আটা বাহির করিয়া, তাই দিয়া চারখানা রুটি বানাইয়া ঠাকুরকে দিল। তাহা গামছায় বাঁধিয়া ঠাকুর পথে রওয়ানা হইল। তারপর সেই কুয়ার কাছে আসিয়া চারিখানা রুটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, "দুইটা খাইব, না চারটা খাইব।"

কুয়ার ভিতর হইতে পরীরা তাহা শুনিতে পাইয়া জোড়হাত করিয়া ঠাকুরকে বলিল, "দেখুন, আমাদিগকে খাইবেন না।"

ঠাকুর খুব রাগ করিয়া বলিল, তোমরা আমাকে নকল মিষ্টির হাঁড়ি দিয়াছিলে। বাড়িতে লইয়া গিয়া এত নাড়াচাড়া করিলাম ; একটা সন্দেশ, রসগোল্লাও বাহির হইল না! আজ তোমাদের চারজনকেই গিলিয়া খাইব।"

পরীরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপ করিয়া বলিল, "এই বাক্সটি লইয়া যান। ইহার মধ্যে হাত দিলেই শাড়ি, গহনা, যা কিছু চাহিবেন পাইবেন।"

বাক্সটি হাতে লইয়া ঠাকুর বাড়ি রওয়ানা হইল। পথের মধ্যে রাত্র হইল। ঠাকুর যাইয়া আবার সেই বন্ধুর বাড়ি অতিথি হইল। এবারও আগের মতোই বাক্সটি পাওয়ার সমস্ত ঘটনা বন্ধুর বউকে বলিল। ঠাকুর ঘুমাইলে বন্ধুর বউ তাহার শিয়র হইতে আসল বাক্সটি সরাইয়া অপর একটি বাক্স সেখানে রাখিয়া দিল।

পরদিন সকালে সেই নকল বাক্সটি লইয়া ঠাকুর বাড়ি গেল। বউকে বলিল, 'জলদি স্নান করিয়া আস। এবার বাক্স আনিয়াছি। ইহার মধ্যে হাত দিলেই শাড়ি, গহনা যা কিছু চাহিবে পাইবে।"

ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করিয়া বউ স্নান করিয়া আসিল। তারপর সেই বাক্সের মধ্যে হাত দিয়া শাড়ি চাহিল— গহনা চাহিল। কিন্তু বাক্স শূন্য ঠন ঠন! কিছুই নাই তাহাতে। তখন রাগিয়া বউ ঝাঁটা হাতে লইয়া ঠাকুর মশায়কে বেদম মারিল।

পরদিন গাট্টি বোঁচকা লইয়া ঠাকুর মশায় বউকে বলিল, "তুমি যখন আমাকে দেখিতে পার না, তখন আমি দেশ ছাড়িয়াই যাইতেছি। এই নাকে খত দিলাম, আর ফিরিয়া আসিব না। দয়া করিয়া আমাকে আর চারখানা রুটি বানাইয়া দাও?"

বউ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কোথায় পাইব আটা যে রুটি বানাইব?"

ঠাকুর অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, "পাড়া প্রতিবেশীর কাছ হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া আমাকে মাত্র চারখানা রুটি বানাইয়া দাও।"

বউ তাহাই করিল। এবাড়ি ওবাড়ি হইতে ধার কর্জ করিয়া আটা আনিয়া ছোট্ট চারখানা রুটি বানাইয়া ঠাকুরের হাতে দিল।

তাহা লইয়া আগের মতো সেই কুয়ার উপরে বসিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিল, "দুইটা খাইব, না চারটা খাইব ?"

পরীরা কুয়ার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "ঠাকুর মশায়! আবার আমাদিগকে খাইতে চান কেন ?"

ঠাকুর মশায় রাগিয়া বলিল, 'খাইব না ? সেবার আমাকে হাঁড়ি দিয়াছিলে। তাহা হইতে একটাও সন্দেশ রসগোল্লা বাহির হইল না। এবার দিয়াছিলে বাক্স তাহা হইতে একখানাও শাড়ি গহনা বাহির হইল না। তোমাদের ফাঁকির জন্য আমি আমার বউয়ের হাতে কত না নাজেহাল হইলাম। দেখ, আমাকে মারিয়া কি করিয়াছে।" এই বলিয়া ঠাকুর মশায় তাহার পিঠ দেখাইল। সমস্ত পিঠ ভরিয়া ঝাঁটার বাড়ির দাগ।

পরীরা তখন একে একে ঠাকুর মশায়ের কাছে সব কথা শুনিল। বাড়ি যাইবার সময় ঠাকুর যে এক বন্ধুর বাড়িতে রাত্রিবাস করে, তাহাও জানিয়া লইল। তাহারা ঠাকুরকে বুঝাইয়া দিল, "বন্ধুর বউ আপনার নিকট হইতে হাঁড়ি ও বাক্স বদলাইয়া লইয়াছে।"

পরীরা সকলে মিলিয়া কি পরামর্শ করিল। তারপর ঠাকুরকে বলিল, "এই লাঠিখানি দিলাম। সঙ্গে লইয়া যান। যাহাকে যখন মারিতে বলিবেন, লাঠি যাইয়া তখনই তাহাকে মারিবে।"

লাঠি লইয়া ঠাকুর পূর্বের মতো সেই বন্ধুর বাড়িতে আসিল। বন্ধুর বউ এই কয়দিন— সেই হাঁড়ি হইতে সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়া আর সেই বাক্স হইতে শাড়ি গহনা পরিয়া একেবারে নতুন মানুষ সাজিয়াছে!

একগাল হাসিয়া বন্ধুর বউ জিজ্ঞাসা করিল, "এবারে কি আনিয়াছ, ঠাকুর ?"

ঠাকুর বলিল, "এবার আনিয়াছি এই লাঠিখানা। যাকে মারিতে বলিব লাঠি তাহাকেই মারিবে।"

বউ অবিশ্বাসের অভিনয় করিয়া বলিল, "ইস, তাই বিশ্বাস হয় ? আচ্ছা দেখাও ত কি করে তোমার লাঠি ?"

ঠাকুর লাঠিকে বলিল, "লাঠি! যাও। আমার বন্ধুর বউকে একটু লাঠি-পেটা কর।"

ঠাকুরের আদেশে লাঠি যাইয়া বন্ধুর বউকে মারিতে লাগিল। বউ কাঁদিয়া ঠাকুরের পায়ে পড়িল। ঠাকুর বলিতে লাগিল, "তবে আন আমার সেই আসল মিষ্টির হাঁড়ি, আন আমার সেই আসল শাড়ি গহনার বাক্স। তবে লাঠিকে মারিতে বারণ করিব।"

বউ আর কি করে! লাঠির বাড়িতে তার সমস্ত শরীর ঝালাপালা হইয়াছে। সেই হাঁড়ি আর বাক্স আনিয়া ঠাকুরের সামনে তাড়াতাড়ি রাখিল। ঠাকুর লাঠিকে মারিতে বারণ করিল। বন্ধুর বউ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পরদিন সকালে, হাতে লাঠি আর দুই বগলে হাঁড়ি আর বাক্স লইয়া ঠাকুর বাড়ি রওয়ানা হইল।

বাড়ির সামনে আসিয়াই ঠাকুর ডাক ছাড়িল, "বউ! শিগ্‌গির যাও— স্নান করিয়া আস।"

পরপর দুইদিন ঠাকুর মশায় ফাঁকি দিয়া বউকে এই সাতসকালে স্নান করাইয়াছে। শীতকালের সকালে স্নান করা কি কম কষ্ট ? বউ ঝাঁটা লইয়া ঠাকুরমশায়কে মারিতে আসিল, "বলি, আবার তুই কেন ফিরিয়া আসিলি ?"

বউ যেই ঠাকুরের গায়ে ঝাঁটার বাড়ি তুলিয়াছে, অমনি ঠাকুর লাঠিকে আদেশ করিল, "লাঠি! যাও ত দেখি, কেন আমার বউ কথা শোনে না ? তাকে একটু লাঠি-পেটা করিয়া আস।"

লাঠি অমনি যাইয়া বউয়ের ঘাড়ে সপাসপ বাড়ি মারিতে লাগিল। বউ এদিক হইতে ওদিকে যায়, লাঠি তাহার পিছে পিছে

ছোটে, ওদিক হইতে সেদিক যায়, লাঠি তাহার পিছে পিছে ছোটে। বউ তখন হাতজোড় করিয়া ঠাকুরের পায়ের উপর দণ্ডবৎ—"শিগ্‌গির তোমার লাঠি থামাও। লাঠির বাড়িতে আমার পিঠ ঝালাপালা হইয়া গেল।"

ঠাকুর তখন বলিল, "তবে যাও, শিগ্‌গির স্নান করিয়া আস।"

বউ বগলে কাপড় লইয়া বলিল, "এই আমি স্নান করিতে যাইতেছি।"

ঠাকুর তখন লাঠিকে থামাইল। বউ স্নান করিয়া আসিলে, ঠাকুর বলিল, "এই বাক্সের মধ্যে হাত দিয়া শাড়ি-গহনা চাও।"

বউ বাক্সের মধ্যে হাত দিয়া শাড়ি পাইল— নানারকমের গহনা পাইল। সেসব পরিয়া এক গাল হাসিয়া ঠাকুর মশায়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর মশায় তখন অপর হাঁড়িটি দেখাইয়া বলিল, "এই হাঁড়ির মধ্যে হাত দিয়া সন্দেশ চাও— রসগোল্লা চাও, তোমার যা কিছু খাইতে ইচ্ছা করে, তা চাও।"

হাঁড়ির মধ্যে হাত দিয়া বউ সন্দেশ চাহিল— সন্দেশ পাইল। রসগোল্লা চাহিল— রসগোল্লা পাইল। আর যাহা চাহিল তাহাও পাইল। তখন ঠাকুর আর তাহার বউ দুইজনে মনের খুশিতে খাইয়া ঢেকুর তুলিতে লাগিল। এরপরে যদি বউ কোনোদিন ঠাকুর মশায়ের উপর রাগ করিতে যায়, ঠাকুর অমনি তাহার লাঠি দেখায়। বউয়ের রাগ গলিয়া পানি হইয়া যায়।

মাঝি ও পণ্ডিত

পণ্ডিত মহাশয় পদ্মানদী দিয়া নৌকা করিয়া বাড়ি যাইবেন। সেইজন্য একমাল্লাই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়াছেন।

বহু দূরের পথ। একা একা কথা না বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় থাকিতে পারেন না। তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মাঝি! তুমি ইতিহাস পড়িয়াছ?"

মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, না কর্তা।"

পণ্ডিত মহাশয় বড়ই অবাক হইলেন, "আচ্ছা, বল কি মাঝি! তুমি ইতিহাস পড় নাই? ইতিহাসে আগেকার দিনের রাজা বাদশার কথা, কত যুদ্ধ বিগ্রহের কথা লেখা থাকে। আগেকার দিনের লোকেরা কি ভাবে চলিত, কি করিত, আরও কত কি ইতিহাস পড়িয়া জানা যায়। তুমি এর কিছুই জান না?"

মাঝি বিনয় করিয়া বলিল, "না কর্তা! আমি মুখুসুখ্যু মানুষ, এসব কিছুই শিখি নাই।"

খানিক যাইতেই পণ্ডিত মহাশয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, মাঝি! তুমি ভূগোল পড়িয়াছ?"

মাঝি বলিল, "না কর্তা।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "মাঝি তোমর জীবনই বৃথা। পৃথিবীটা গোলাকার। তার কোন কোনায় কোন দেশ, কোথায়

কোন নদী, কোথায় কোন পাহাড়, কোন দেশের লোক কেমন, কোথায় কোন জিনিস পাওয়া যায় এর সবকিছু ভূগোলে লেখা থাকে। সেই ভূগোল তুমি পড় নাই ? মাঝি তোমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ?"

মাঝি হাই তুলিয়া নৌকা বাহিতে লাগিল।

খানিকবাদে পণ্ডিত মহাশয় আবার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাঝি! তুমি বিজ্ঞান পড়িয়াছ ?"

মাঝি পূর্বের মতোই উত্তর করিল, "আজ্ঞে, না কর্তা।"

"বল কি মাঝি ? আজ পৃথিবী বৈজ্ঞানিকদের মুঠার মধ্যে। কেন রোদ হয়, কেন বৃষ্টি হয়, কোথা হইতে বিজলি আসে, ইলেকট্রিক, রেডিও, উড়োজাহাজ, আর অ্যাটমবোম কিসে হয় এর সবকিছুই বিজ্ঞান পড়িলে জানা যায়। আজ বিজ্ঞানের জোরে মানুষ চান্দে যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে। মাঝি! তুমি কিছুই জান না। বাঁচিয়া থাকিয়া তুমি মরার মতো হইয়া রহিয়াছ। তোমার জীবনই বৃথা।"

এমন সময় আকাশের কোনায় একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। ঝড় হয়-হয়। নৌকাও পদ্মানদীর মাঝখানে। ঝড়ের আগে কিনারায় আসিবার জো নাই।

মাঝি তখন পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি সাঁতার জানেন ? আকাশে যে মেঘ করিয়াছে ; ঝড় আসিল বলিয়া!"

পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'না মাঝি! আমি ত সাঁতার জানি না।"

তখন মাঝি বলিল, "আমি ইতিহাস জানি না, ভূগোল জানি না, বিজ্ঞান জানি না, এজন্য আমার জীবন বৃথা বলিয়াছেন। কিন্তু

এত জানিয়াও একমাত্র সাঁতার না শেখাতে আপনার জীবনও বৃথা হইতে চলিল।"

কথা বলিতে বলিতে নদীতে ঝড় উঠিয়া নৌকা ডুবাইয়া লইল। মাঝি সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় পানিতে ডুবিয়া মারা গেলেন।

আমের স্বাদ

ইরান-তুরান দেশের বাদশা দিল্লি জয় করিয়া বঙ্গ ভারতের বাদশা হইয়া বসিলেন। একদিন দরবারে বসিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁর উজিরকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখরে উজির! আমি লোকের মুখে শুনিয়াছি, এই ভারত মুল্লুকে এক প্রকারের ফল আছে। তাহার নাম আম। যেমন তাহার খোশবু, খাইতেও তেমনি মধুর। তুমি জলদি করিয়া আমার জন্য কয়েকটি আম লইয়া আস।"

তখন শীতকাল। কোথাও আম পাওয়া যায় না। উজির জোড়হাতে কুর্নিশ করিতে করিতে বলিল, "বাদশা নামদার! আলম্পনা! জাঁহাপনা! বান্দার গোস্তাকি মাফ করুন, এটা শীতকাল। এখন আম পাকে না। সুতরাং আম খাইতে হইলে জাঁহাপনাকে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।"

উজিরের কথা শুনিয়া বাদশা গোস্বায় জ্বলিয়া উঠিলেন। কি, এতবড় দেশের বাদশা তিনি! যাঁহার হুকুমে বাঘে-গরুতে একঘাটে পানি খায় ; তাঁহাকে কিনা একটি সামান্য আম খাইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে! বাদশা আদেশ করিলেন,

"দেখরে উজির! তুমি জানিয়া জান না,
সাত দিবসের মধ্যে যদি তুমি আম না
খাওয়াইতে পার—
তবে তোমার কাটিবে গর্দানা।"

শুনিয়া উজির ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। বাদশার আদেশ নাকচ হইবার নয়।

উজির ঘুমায় না— খায় না, নায় না, দিন ভরিয়া চিন্তা করে,— রাত ভরিয়া চিন্তা করে, কি করিয়া বাদশাকে আম খাওয়ানো যায়। উজির এ বনে যায়,— ও বনে যায়,— সারি সারি আম গাছ। তার পাতার আড়ালে কোথাও একটি আম দেখিতে পায় না। আর পাইবে কি! অসময়ে কি আমগাছে আম ধরে ? মাঝে মাঝে আমগাছ হইতে এক একটি শুকনা পাতা ঝরিয়া পড়িয়া উজিরকে উপহাস করিতে থাকে।

ভাবিতে ভাবিতে একদিন উজিরের মনে একটি বুদ্ধি আসিল। সাতদিন গত হইলে সকালে উজির কিছু তেঁতুলের রস আর চিটাগুড় একত্র করিয়া তার সমস্ত দাড়িতে মাখাইল। তারপর যথাসময়ে বাদশার দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইল।

দরবারের সমস্ত কাজ রাখিয়া বাদশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখরে উজির! তুমি সেই আম্রফলের খোঁজ পাইয়াছ ?"

উজির হাতজোড় করিয়া বলিল, "খোদাবন্দ আলম্পনা! জাঁহাপনা! বান্দার গোস্তাকি মাফ করিবেন! এই অসময়ে আমি জাঁহাপনাকে সত্যকার আম খাওয়াইতে পারিব না। কিন্তু আমের যে কিরূপ স্বাদ, আপনাকে তাহা অনুভব করাইতে পারিব। আপনি আমার এই দাড়িতে জিহ্বা লাগাইয়া দেখুন, আপনি আমের স্বাদ পাইবেন।"

এই বলিয়া উজির বাদশার সামনে যাইয়া, তাহার দাড়ি আগাইয়া ধরিল। বাদশা উজিরের দাড়িতে জিহ্বা লাগাইয়া বলিলেন, "চমৎকার ! —তোফা—তোফা!"

তখন সভাসদেরা জিজ্ঞাসা করিল, "বাদশা নামদার! উজিরসাহেবের দাড়িতে জিহ্বা লাগাইয়া আপনি কি বুঝিলেন ?"

বাদশা সহাস্যে বলিলেন, "আমি বুঝিলাম, আম খাইতে সামান্য টক=মিশানো মিষ্টি, আর কিঞ্চিৎ আঁশযুক্ত।"

উজির হাতজোড় করিয়া বলিলেন, “জাঁহাপনা সত্যই অনুভব করিয়াছেন।”

সে যাত্রা উজিরের গর্দান রক্ষা পাইল। উজিরের এই উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া বাদশা তাহাকে একজাহার টাকা ইনাম দিলেন।

অনুমতি পত্র কে দেখাইবে?

বনের মধ্যে দুইঘর শেয়াল। পাশাপাশি বাস করে। ও-বাড়ির শেয়াল রোজ রাতে মোরগ, মুরগি, হাঁস, কবুতর চুরি করিয়া আনে। শেয়ালনি সেগুলো টুকরো করিয়া দাঁত দিয়া চিরিয়া তার ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, নিজেরাও কতক খায়, কতক ফেলায়। খাইয়া দাইয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাইয়া গুমর করিয়া কথা কয়। তাদের গায়ে তেল চকচক করে। শেয়ালনি গুমরে মাটিতে পা ফেলায় না। শানকুনি সাপের চামের জামা পরিয়া, শামুকের মালা গলায় পরিয়া শেয়ালনি বন ভরিয়া ঘোরে।

আর এ-বাড়ির শেয়াল কিছুই আনিতে পারে না। মাঝে মাঝে মাঠ হইতে মরা গরুর শুকনো ঠ্যাং, মাছের কাঁটা আর ছাগ বকরির হাড় কুড়াইয়া লইয়া আসে। তা কি দাঁতে ভাঙা যায়? তাই খাইয়া শেয়াল আর শেয়ালনি কোনোরকমে জীবন ধারণ করে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলি সেই শুকনো হাড়গোড়রও খাইতে পারে না। না খাইয়া তাহারা শুকাইয়া পাটখড়ি হইয়া গিয়াছে। দিনরাত খাবার দাও, খাবার দাও বলিয়া মায়ের শুকনো স্তন চাটিতে থাকে। সেই স্তনেও কি দুধ আছে? না। না খাইয়া শেয়ালনির স্তনের দুধও শুকাইয়া গিয়াছে।

সেদিন বাচ্চাদের কান্নায় থাকিতে না পারিয়া শেয়ালনি শেয়ালকে বলিল, "তুমি একেবারে অকস্মা। ও-বাড়ির শেয়াল

রোজ রাত্রে গেরস্তবাড়ি হইতে কত হাঁস মুরগি লইয়া আসে। তুমি আন শুধু মরা গরুর শুকনো হাড়। হাঁস মুরগি চোখে দেখিতে পাও না ?"

শেয়াল বলিল, "শেয়ালনি ! তুমি রাগ করিও না। আমি ত সারারাত চেষ্টা করি। গেরস্তবাড়ি গেলেই তাদের কুকুরটা আমার উপর তাড়িয়া আসে। কি করিয়া হাঁস মুরগি আনিব ?"

কথাটা ত সত্যই। শেয়ালনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তুমি যাও— ও-বাড়ির শেয়ালের কাছে উপদেশ লইয়া আস। তাহার কাছে জানিয়া আস কি করিয়া গেরস্তকে ফাঁকি দিয়া হাঁস মুরগি চুরি করিয়া আনা যায়!"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ও-বাড়ির দরজায় যাইয়া, "হুয়া-হুয়া কি কর ভায়া ?" বলিয়া শেয়াল উপস্থিত হইল।

ও-বাড়ির শেয়াল লেজ উঁচু করিয়া ডাকিল, "কি হুয়া— কি হুয়া! ভাই শেয়াল ?"

এ-বাড়ির শেয়াল বলিল, "দেখ ভাই! তুমি রোজ গেরস্তবাড়ি হইতে হাঁস মুরগি চুরি করিয়া আনিয়া খাও। আমি ত একদিনও কিছু আনিতে পারি না। আমার গৃহিণী আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিল। বল ত ভাই, কি করিয়া তুমি হাঁস মুরগি চুরি কর?"

হাঁস মুরগি চুরি করিবার কৌশল আছে। সে প্রথমে তার শেয়ালনিকে গেরস্তবাড়ির নিকটের জঙ্গলে যাইয়া ডাকিতে বলে। শেয়ালনির ডাকে গেরস্তবাড়ির কুকুর দৌড়াইয়া যায় তাকে তাড়া করিয়া। শেয়ালনি তখন গভীর জঙ্গলে যাইয়া পালায়। ইতিমধ্যে শেয়াল গেরস্তবাড়ির মোরগ মুরগির খোপ হইতে ইচ্ছামতো হাঁস, মুরগি, কবুতর চুরি করিয়া লইয়া আসে। এক বাড়িতে রোজ চুরি করিতে গেলে গেরস্ত হুশিয়ার হইয়া উঠে। তাই আজ যদি সে এ-

গ্রামের ওই বাড়িতে হানা দেয়, কাল সে আর এক গ্রামের আর এক বাড়িতে যাইয়া মোরগ মুরগি ধরিয়া আনে। এইসব তার ব্যবসায়ী কৌশল। যাকে তাকে ত বলা যায় না!

সে তাই ফাঁকি দিয়া কহিল, "ভাই! আমি ত এমনিই মোরগ মুরগি ধরিয়া আনি। তুমিও যাও না ভাই!"

এ-বাড়ির শেয়াল বলিল, "আরে ভাই! আমি ত কতবার গিয়াছি চুরি করিতে, কিন্তু গেরস্তবাড়ির বাঘা কুকুরটা যখন তাড়িয়া আসে, তখন ত পালাইয়া প্রাণ পাই না।"

ও-বাড়ির শেয়াল বিজ্ঞের মতো হাসিয়া বলিল, "তুমি তাও জান না? সমস্ত পশুজাতির রাজা হইল সিংহ! আমার কাছে সেই সিংহ রাজার অনুমতিপত্র আছে। হাঁস মুরগি ধরিতে গেলে কুকুর যখন তাড়িয়া আসে, তখন আমি সেই অনুমতিপত্র দেখাই। কুকুর অমনি চুপ করিয়া থাকে। কুকুরও ত পশু! সে কি পশুরাজের হুকুম অমান্য করিতে সাহস পায় ?"

শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "সিংহরাজের দেখা কোথায় পাইব?"

"আরে তাও জান না ? ওই পাহাড়টা দেখিতে পাইতেছ না ? তারই একটু ওধারে যে ঘন শালবন আছে, সেইখানে সিংহ থাকে।"

এই কথা শুনিয়া মনের আনন্দে হুয়া হুয়া ডাকিতে ডাকিতে শেয়াল বাড়ি ফিরিল। সারারাত শেয়ালনির সঙ্গে এ বনে সে বনে ঘুরিয়া কয়েকটি কাঁকড়া আর কিছু মধুর চাক সংগ্রহ করিল। পশুরাজের সঙ্গে দেখা করিতে ত খালি হাতে যাওয়া যায় না! শেয়ালনি গোপনে কিছু সজারুর কাঁটা জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্দিনে ছেলেমেয়েদের খাইতে দিবে। তাও একটা ছাগলের চামড়ায় বাঁধিয়া দিল। তারপর সারারাত জাগিয়া দুইজনে নানারকম জল্পনা কল্পনা চলিল, কিভাবে সিংহের নিকট যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে, কিভাবে তাহাকে সালাম করিতে হইবে।

সকাল হইলে সবকিছু সঙ্গে লইয়া, একটি ব্যাঙের ছাতি মাথায় দিয়া শেয়াল পশুরাজ সিংহের বাড়ি রওয়ানা হইল।

ঘন বেতের জঙ্গল ছাড়িয়া বড় বড় জামগাছ, আমগাছ। সেইসব গাছের ডালে ডালে জড়াইয়া রহিয়াছে শ্যামালতা, আমগুরুজ লতা, আর জারমনি লতার ঝাড়। সেসব ছাড়াইয়া শালের বন। শালফুলের গন্ধে বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছের ডালে ডালে মৌমাছির চাক হইতে টস্ টস্ করিয়া মধু ঝরিয়া পড়িতেছে। সেসব ছাড়াইয়া ঘন শ্বেতখড়ির বন। সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া সমস্ত বন আলো করিয়া রাখিয়াছে। যাইতে যাইতে শেয়াল দেখিতে পাইল, সামনেই সিংহরাজার বাড়ি। পাহাড়ের সামনে একটি গহ্বর। সামনে নানারকম জানোয়ারের হাড়গোড় কত যে পড়িয়া রহিয়াছে কে তাহা নিরূপণ করিবে ?

সেইখানে যাইয়া শেয়াল ডাকিয়া উঠিল, "হুয়া, হুয়া, হুয়া!" গহ্বরের ভিতর হইতে সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল, "গোঁ— গোঁ— কে গোঁ?"

শেয়াল দশ হাত সালাম করিয়া জোড়হাতে উত্তর দিল, "মহারাজ! আমি আপনার গরিব প্রজা শেয়াল। আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ভেট লইয়া আসিয়াছি।"

এই বলিয়া শেযাল ছাগলের চামড়ায় বাঁধা সেইসব দ্রব্যসামগ্রী আর মৌমাছির চাকখানা সিংহের সামনে তুলিয়া ধরিল। মৌমাছির চাকখানা মুখে পুরিয়া সিংহ বড়ই খুশি হইল।

সে হাসিয়া বলিল, "তা কি মনে করিয়া শেয়াল ?"

শেয়াল জোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি রোজ রাত্রে গেরস্তবাড়িতে হাঁস মুরগি ধরিতে যাই ; কিন্তু গেরস্তবাড়ির কুকুরটা আমাকে দেখিলেই তাড়িয়া আসে। আপনি আমাকে একখানা অনুমতিপত্র দিন। তাহার মধ্যে এমন সব কথা লিখিয়া দিবেন, যাহা পড়িয়া কুকুর যেন আমাকে দেখিয়া তাড়িয়া না আসিতে পারে।"

শেয়ালের কথা শুনিয়া সিংহ খুব কৌতুক বোধ করিল। এমনভাবে ত কেহ তাহার কাছে অনুমতিপত্র চাহিতে আসে না! কিন্তু কি করিয়া সিংহ অনুমতিপত্র লেখে। সে ত সত্যই লেখাপড়া জানে না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার লেজ

হইতে কয়েক গুচ্ছ লোম ছিঁড়িয়া দিল। আর বলিল, "এই তোমার অনুমতিপত্র। কুকুর যখন তোমার উপর তাড়া করিয়া আসিবে, তখন এটা দেখাইলেই সে শান্ত হইয়া যাইবে।"

সিংহরাজের নিকট হইতে অনুমতিপত্র পাইয়া শেয়াল খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিল।

রাত্র হইলে সে সেই অনুমতিপত্র ঠোঁটে আটকাইয়া, গেরস্তবাড়ির মুরগির ঘরে হানা দিল। তৎক্ষণাৎ গেরস্তবাড়ির বাঘা কুকুরটি ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া তাড়িয়া আসিল।

শেয়াল তখন নিরুপায় হইয়া বনের মধ্যে পলাইয়া গেল। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া শেয়ালের বউ বলিল, "কুকুর যখন তাড়িয়া আসিল, তখন তুমি সিংহের দেওয়া অনুমতিপত্রখানা দেখাইলে না কেন ?"

শেয়াল বলিল, "তুমি ত বলিলে অনুমতিপত্র দেখাইলে না কেন ? কিন্তু মারমুখো হইয়া কুকুর যখন তাড়িয়া আসিল, তখন অনুমতিপত্র দেখায় কে ? কার বুকে কতখানি সাহস আছে যে কুকুরের সামনে যাইয়া দাঁড়াইবে ?"

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

শ্বশুর জামাই

অনেক দিন জামাই শ্বশুরবাড়ি আসে না। সেইজন্য শ্বশুরের বড় নিন্দা। গাঁয়ের লোকেরা বলে, তোমাদের বাড়ি জামাই আসে না কেন ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা গোপন কারণ আছে।

কারণ যাহা আছে, শ্বশুর ত তাহা ভালই জানেন। শ্বশুরবাড়িতে জামাইর শালা নাই, শালী নাই। ইয়ারকি-ঠাট্টা করিবার কেহ নাই। সেই জন্যই ত জামাই শ্বশুরবাড়িতে আসে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্বশুর ঠিক করিলেন, এবার যেমন করিয়াই হোক, জামাইকে আনিতে হইবে। নাহয় শ্বশুর হইয়াই জামাইর সঙ্গে একটু ঠাট্টা-ইয়ারকি করিবেন। বাড়িতে অন্য লোক নাই। কেহ ত দেখিতে আসিবে না।

হাটের মধ্যে জামাইর সঙ্গে শ্বশুরের দেখা হইল। শ্বশুর জামাইকে বলিলেন, "তা বাবাজি, আমাদের ওমুখো যে হন-ই না, আজ চলুন আমাদের ওখানে।" জামাই উত্তর করিল, 'আপনাদের ওখানে কি আর যাইব! শালা নাই, শালী নাই, কার সঙ্গে কথাবার্তা কহিব ?"

শ্বশুর মিথ্যা করিয়া বলিলেন, "তা এবার ঢাকা হইতে আমার এক ভাইজি আসিয়াছে। কলেজে পড়ে। সম্পর্কে তোমার শালী, তার সঙ্গে অনেক হাসি-তামাশা করিতে পারিবে।"

জামাই রাজি হইয়া শ্বশুরবাড়িতে আসিল। আসিয়া দেখে, ঢাকা হইতে কেহই আসে নাই। শ্বশুর তাহাকে ফাঁকি দিয়াছেন। জামাই ভাবিল, আজকের দিনটি মাটি হইল।

শ্বশুর যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা ত তাঁহার মনেই আছে!

আহারের সময় হইল। শ্বশুরবাড়ি আসিয়া জামাইরা শালা-শালী লইয়া এক থালায় ভাত খায়। শ্বশুর তাঁর স্ত্রীকে বলিলেন, "দেখ, বড় থালাখানায় আজ আমাদের ভাত দাও। আমি আর জামাই এক থালায় ভাত খাইব।"

শ্বশুর আর জামাই একসঙ্গে এক থালায় ভাত খাইতে বসিলেন। নানারকম তরকারি দিয়া খাওয়া চলিতে লাগিল। শ্বশুর ভাবিলেন, চালাকি করিয়া জামাইকে ক্ষীর খাইতে দিব না।

তিনি জামাইকে বলিলেন, "জামই খাওয়া ত হইয়াছে, এবার হাত ধোও।"

জামাই দেখিল, শ্বশুর তাহাকে ক্ষীর না খাওয়াইয়া ঠকাইবার মতলব করিয়াছেন। জামাই তখন এক গল্প ফাঁদিয়া বলিল, "হাত আর ধুইব কি? আপনাদের বাড়িতে আসিবার সময় সামনে পড়িল এক প্রকাণ্ড সাপ। কহিলে বিশ্বাস করিবেন না, আমাকে না দেখিয়া, ও-ই যে শিকার উপরে ক্ষীরের হাঁড়িটা ঝুলিতেছে না ? ও-ই অত উঁচু একটা ফণা মেলিয়া ধরিল সাপটা আমার দিকে।"

শ্বশুর দেখিলেন, ধরা পড়িয়াছেন। জামাই ক্ষীরের কথা টের পাইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত! ক্ষীরের কথা ত একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে। আন আন, ক্ষীর আন।"

শাশুড়ি একটু মুচকি হাসিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষীর আনিয়া দিলেন। ক্ষীরের সঙ্গে মাখিয়া খাইবার জন্য কিঞ্চিৎ ভাতও দিলেন।

জামাই ভাবিল, 'শ্বশুর আমাকে ক্ষীর খাওয়া হইতে বঞ্চিত করিতেছিলেন, এবার আমি তাঁহাকে ক্ষীরই খাইতে দিব না।" জামাই শ্বশুরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল, "এখনকার কলিকালের কথা আর কি বলিব ? বউরা স্বামীকে মানিতে চায় না। এই আপনাদের মেয়ে, যাহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি ; আমি যদি

তাকে বলি এদিক থাক, সে চলিয়া যায় ওদিকে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দেখাইয়া দিবার অজুহাতে জামাই পাতের ক্ষীরটুকু নিজের দিকে টানিয়া লইয়া ভাতগুলি শ্বশুরের দিকে ঠেলিয়া দিল।

শ্বশুর দেখিলেন, 'ঠকাইবার মতলবে জামাই আমাকে ক্ষীর খাইতে দিবে না। আচ্ছা দেখাইতেছি!'

উপদেশের ছলে শ্বশুর জামাইকে বলিলেন, "তা বাবাজি! তোমরা ছেলে ছোকরা মানুষ। মিলমিশ হইয়া থাক, মিলমিশ হইয়া থাক।"

বলিতে বলিতে তাহা দেখাইয়া দিবার অজুহাতে ক্ষীর ও ভাত একসঙ্গে মাখিয়া ফেলিলেন।

বড়ই আনন্দের সঙ্গে শ্বশুর জামাইর খাওয়া শেষ হইল।

অচ্ছুৎ

কাককে কেহ ভালবাসে না। তার গায়ের রং কালো। কথার সুরও কর্কশ। তাই বলিয়াই কি কাককে অবহেলা করিতে হইবে ? সকলেই কি সুন্দর ? সকলের স্বরই কি মিষ্টি ? যেখানে আবর্জনার মধ্যে দু'একটি খাবার জিনিস পড়িয়া থাকে, কাক তা খুঁটিয়া খায় ; ইঁদুর, আরসুলা, ব্যাঙ মরিয়া গেলে কাক তা কুড়াইয়া খায়।

মাটির উপর যে কত রকমের পোকা জন্মে। কাক সেগুলি খুঁটিয়া খায়। এজন্য জার্মানির বিজ্ঞানীরা কাকের কত তারিফ করে।

কাক না থাকিলে সেগুলি পচিয়া গন্ধ হইত। পথ চলা যাইত না। সবজি বাগানে, শস্যক্ষেতে পোকা লাগে। অন্যান্য পাখিদের মতো কাকও তাহাদের ধরিয়া খায়। সেইজন্যই ত বাগানভরা এত রকমের সবজি। ক্ষেতভরা এত রকমের শস্য। তবু সবাই কাককে অবহেলা করে। কাছে আসিলে দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

কাকের ভারি ইচ্ছা করে, আর-সব পাখিদের সঙ্গে সে খুব ভাব করে। তাদের সঙ্গে মিশিতে পারিলে সে জাতে উঠিতে পারে। কিন্তু কে তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে ? কোকিল যদিও কাকের মতো কালো, কিন্তু তাহার গানের সুর লইয়া কবিরা এত কিছু লিখিয়াছে যে, সে গুমরেই তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না। কাকাতুয়া, ময়না, বুলবুল এরাও একই জাতের। কিন্তু কি করিয়া সে নিজের অচ্ছুৎ নাম ঘুচাইবে,— কি করিয়া সে দলে উঠিবে ?

ছোট চড়াই পাখিটা দূর্বাঘাসের উপর খেলা করিতেছিল। কাক যাইয়া তাহাকে বলিল, "চড়ুই ভাই! তুমি আমাকে তোমার জোটে লইবে? তুমি আমার বন্ধু হইবে ?"

চড়ুই বলিল, "তুমি কাক। অচ্ছুৎ। সব সময় নোংরা থাক। তোমার সঙ্গে কে বন্ধুত্ব করিবে ?"

কাক বলিল, "দেখ ভাই! আমি গরিব কাক। টাকা-পয়সা নাই যে, আর-সব পাখিদের মতো রং-বেরঙের পোশাক পরিব। আমি পথে-ঘাটের কত নোংরা জিনিস খাই। সেইজন্যই আমি কিছুটা নোংরা। কিন্তু একথাটাও মনে রাখিও, আমি না থাকিলে পথে-ঘাটে দুর্গন্ধ হইত। তোমরা চলিতে পারিতে না। দেখ ভাই! তুমি যদি আমার বন্ধু হও, তবে তোমার নিকট হইতে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা লইব। বুনিয়াদি ঘরের তোমরা, আমাদের সঙ্গে মেশ না বলিয়াই ত আমরা ভাল হইয়া থাকিবার শিক্ষা পাই না।"

চড়ুই পাখি ভাবে, একটা ছোটলোক আসিয়া কি বকর বকর লাগাইল! কিন্তু সে বড় ঘরের ছেলে, মুখে একটু ভদ্রতার ভাব দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা যা নদী হইতে ঠোঁট দুইটি ভালমতো ধুইয়া আয়। তখন তোর সঙ্গে মেলামেশা করিব।"

নদী যে তার পানিতে কাককে ঠোঁট ধুইতে দিবে না, চড়ুই তাহা জানিত।

কাক নদীর কাছে যাইয়া বলিল,

"নদী ভাই! নদী ভাই! দাও জল, ধুব ঠোঁট,
তবে নেব চড়ুইর জোট।"

নদী বলিল, "দূর বেটা কাক! তুই অচ্ছুৎ। আমার জলে যদি তোর ঠোঁট দুইতে দেই, তবে আমিও অচ্ছুৎ হইব। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আর আমার জলে নাহিতে আসিবে না।" মুখখানা বেজার করিয়া কাক চলিয়া যাইতেছিল।

নদীর একটু দয়া হইল। বলিল, 'দেখ্, কাক! একটি ঘটি লইয়া আয়। তাতে করিয়া জল তুলিয়া ঠোঁট ধুইস।"

কিন্তু ঘটি কোথায় পাওয়া যায় ? কাক কুমারের বাড়িতে গেল।

"কুমার ভাই! কুমার ভাই!
দাও ঘটি, ভরব জল,
ধুব ঠোঁট,
তবে নেব চড়ুইর জোট।"

কুমার বলিল, 'ঘটি ত নাই। তবে মাটি যদি লইয়া আসিতে পারিস আমি ঘটি গড়াইয়া দিতে পারি।"

কাক তখন মোষের কাছে যাইয়া বলিল,

"মোষ ভাই! মোষ ভাই!
খুঁড়বে মাটি, গড়বে ঘটি,
ভরব জল, ধুব ঠোঁট,
তবে নেব চড়ুইর জোট।"

মোষ বলিল, "আমি কেমন করিয়া মাটি খুঁড়িব! রাখাল আমাকে ঘাস দেয় না। আজ সাতদিন কিছুই আহার করি না।"

কাক তখন মাঠের কাছে গেল,

"মাঠ ভাই! মাঠ ভাই!
দে তো ঘাস, খাবে মোষ
খুঁড়বে মাটি, গড়বে ঘটি,
ভরব জল, ধুব ঠোঁট,
তবে নেব চড়ুইর জোট।"

মাঠ বলিল, "ঘাস ত আছে ; কিন্তু কাটিয়া দিবে কে ?"

কাক তখন রাখালের কাছে গেল,

"রাখাল ভাই! রাখাল ভাই!
কাটো ঘাস, খাবে মোষ,
খুঁড়বে মাটি, গড়বে ঘটি,
ভরব জল, ধুব ঠোঁট,
তবে নেব চড়ুইর জোট।"

রাখাল বলিল, "কি দিয়া ঘাস কাটিব ? আমার যে কাস্তে নাই।"

কাক তখন কামারবাড়ি গেল,

"কামার ভাই! কামার ভাই!
গড় কাস্তে, নেবে রাখাল,
কাটবে ঘাস, খাবে মোষ
খুঁড়বে মাটি, গড়বে ঘটি,
ভরব জল, ধুব ঠোঁট,
তবে নেব চড়ুইর জোট।"

কামার বলিল, "কি করিয়া কাস্তে গড়িব ? আগুন নিভিয়া গিয়াছে। আগুন লইয়া আয়, তবে কাস্তে গড়িব।"

কাক তখন গেরস্তবাড়িতে গেল,

"গেরস্ত ভাই! গেরস্ত ভাই!
দাও আগুন, গড়বে কাস্তে,
কাটবে ঘাস, খাবে মোষ,
খুঁড়বে মাটি, গড়বে ঘটি,
ভরব জল ধুব ঠোঁট,
তবে নেব চড়ুইর জোট।"

গেরস্ত তখন এক হাতা আগুন আনিয়া কাককে দিল। কিসে করিয়া আগুন লইবে কাক?

কিন্তু আগুন লইয়া না গেলে ত সে জাতে উঠিতে পারিবে না। অচ্ছুৎ হইয়া থাকার চাইতে মরণও ভাল।

সে তার পাখা পাতিয়া দিল আগুন লইবার জন্য। পাখায় আগুন লইয়া যেই কাক আকাশে উঠিয়াছে, অমনি সে পুড়িয়া মরিয়া গেল।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বাঙালির হাসির গল্প

অবশেষে বাঙালির হাসির গল্প বই আকারে ছাপা হইল। এই গল্পগুলি বহুদিন আমার মনে থাকিয়া বাহির হইবার জন্য কিচির মিচির করিত। ছোটদের সঙ্গে দেখা হইলেই আমি তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতাম।

তাহাদের মধ্যে যাইয়া ইহারা হাসিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খেলিত। কিন্তু সব ছোটদের সঙ্গে ত আমার দেখা হইতে পারে না। তাহারা ছড়াইয়া আছে এদেশে, সেদেশে, কত দেশে।

তাই গল্পগুলিকে আজ কাগজের পাতায় লিখিয়া ছাড়িয়া দিলাম। ছোটদের মধ্যে যাইয়া তাহারা যদি হাসিয়া নাচিয়া খেলা করিতে পারে, তবেই বুঝিব, আমার লেখা কাজে লাগিয়াছে।

একই গল্প ছোটদের মধ্যে বারবার বলিয়া সেই গল্পের বিষয়ে অনেক মজার মজার কথা আমার মনে আসিয়াছে। গল্পের নতুন নতুন মানে আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি। তার সবকিছু আমি গল্পগুলির মধ্যে ভরিয়া দিয়াছি। কিন্তু গল্পগুলিকে বদলাই নাই।

ছোটদের জন্য লিখিতে হইল ত! কিন্তু তারা কি সহজে খুশি হয় ? তাই গল্পগুলি তাহাদের কাছে বারবার বলিয়া যে যে গল্প তাহাদের ভাল লাগিয়াছে সেগুলিই লিখিয়া ফেলিলাম শুধু। একবার লিখিয়াও খুশি হইতে পারিলাম না। বারবার করিয়া লিখিলাম। আমার খাতাগুলি যদি তোমরা দেখ, বুঝিতে পারিবে, আমি কত কাটাকুটি করিয়া, কথাকে কত অদল-বদল করিয়া,

এই বইখানা লিখিয়াছি। এই গল্পগুলি লিখিতে দশ-বারো বৎসর আমাকে তপস্যা করিতে হইয়াছে।

এই গল্পগুলি আমি কোথায় পাইলাম, তোমরা জানিতে চাহিবে। এগুলি আমাদের গ্রামদেশে এর মুখে, ওর মুখে, তার মুখে ছড়াইয়া ছিল। আমি নানা গ্রামে ঘুরিয়া, নানা লোকের সঙ্গে মিতালি করিয়া, এমনি প্রায় শ-দুই গল্প শুনিয়াছি। তার সবগুলি তোমাদের কাছে বলা যায় না। সেগুলি হইতে বাছিয়া এই বাঙালির হাসির গল্পে সাজাইয়া দিলাম।

এই গল্পগুলি কার কার নিকট হইতে সংগ্রহ করিলাম তোমরা জানিতে চাহিবে।

আমাদের ফরিদপুরে ছিলেন এক সরকারি পিসেমশাই। তাঁর নাম শ্রীসূর্যকুমার রায়। কিন্তু সবাই তাঁকে পিসেমশাই বলিয়া ডাকিতাম। কেন পিসেমশাই বলিতাম, কে সকলের আগে তাঁকে পিসেমশাই বলিয়া ডাকিয়াছিল জানি না। কিন্তু তিনি আমাদের যেমন পিসেমশাই ছিলেন, বড়দেরও তেমনি পিসেমশাই ছিলেন। তাঁকে লইয়া ছোটদের সঙ্গে বড়দের কাড়াকাড়ি পড়িত। আমাদের দুঃখের সীমা থাকিত না, যখন আমাদের গল্পের আসর হইতে অভিভাবকেরা তাঁকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন গল্প শুনিতে।

হাত-পা নাড়িয়া, নানা অভিনয় করিয়া তিনি গল্প বলিতেন না। কিন্তু তাঁর বলার মধ্যে কি যে ছিল, তাহা আজও খুঁজিয়া পাই নাই। তাঁর দুইটি চোখই ছিল যেন সকল হাসির মূল। গল্প বলিতে এমন করিয়া চাহিতেন, আমরা হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতাম। সেই পিসেমশায়ের কাছে আমি 'আয়না' আর 'গুরুঠাকরের ভাগবত পাঠ' গল্প দুইটি শুনিয়াছিলাম। পিসেমশায় এখন বাঁচিয়া আছেন কি না, জানি না। হয়তো বাঁচিয়া নাই।

আমার এক অন্ধ দাদাজান ছিলেন। আমর পিতার চাচা। তিনি যে কত রকমের খোশগল্প, রূপকথা, শ্লোক জানিতেন, তা লেখাজোকা নাই। তাঁর নিকট হইতে 'সেরটা কত বড়' 'আলসে'

'ভাগাভাগি', 'অচ্ছুৎ', 'জিদ' গল্পগুলি আমি অতি ছেলেবেলায় শুনি।

সেটা বোধহয় ১৯২০ সন। অসহযোগ আন্দোলনে আমি স্কুলের পড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়াছি। কলেজ স্কোয়ারে একজন বুড়ো লোক রোজ আসিয়া গল্প বলিতেন। কি তাঁর বলার ভঙ্গি! হাত-পা নাড়িয়া নানা ভঙ্গি করিয়া গল্পের ঘটনাটিকে তিনি অভিনয় করিয়া দেখাইতেন। তাঁর গল্প বলা শেষ হইলে ছোটরা তাঁকে প্রসেশন করিয়া বাড়ি আগাইয়া দিয়া আসিত।

তাঁর নিকটে 'কে বড়' গল্পটি শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আমার লেখায় তাঁর সেই গল্প বলার ভাবভঙ্গি কিছুই ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। বাইশ-মণ-পলোয়ানের পুকুরে নামিয়া জলপান করা দেখাইতে তিনি মুখের ভিতর হইতে এমনি শব্দ বাহির করিতেন যে, জলের কলকলানি শব্দ আমরা শুনিতে পাইতাম। এমন সুন্দর করিয়া হাসির গল্প বলিতে আর কাহাকেও দেখিলাম না।

'পরের ধনে পোদ্দারি' গল্পটি ফরিদপুরের বিল নাইলা গ্রামের অবদুল হামিদ মিঞার নিকটে শুনিয়াছিলাম।

'চুক্তি' গল্পটি আমার মেজো ছেলে জামাল আনোয়ার কোথা হইতে শুনিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল।

'গোপ্যার বউ' গল্পটি ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসনের এরোন ফকিরের নিকট শুনিয়াছিলাম।

'ঠাকুরমশায়ের লাঠি' গল্পটি যশোহর জেলার এক ডাক্তার সাহেবের নিকট আমি প্রথম শুনি।

'অনুমতিপত্র কে দেখাইবে' ত্রিপুরা জেলার নুরুল ইসলাম আমাকে বলিয়াছিল।

একবার গ্রাম্যগান সংগ্রহ করিতে আমি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার চানরা গ্রামে যাই। চার-পাঁচদিন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। যে-বাড়িতে আমি ছিলাম, সে বাড়িতে একজন অতিথি আসিয়াছিলেন। তিনি মাদারীপুরে ওকালতি করিতেন।

বৃষ্টির এই চার-পাঁচটি দিন তিনি নানা-রকম গল্প বলিয়া আমাদিগকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। পিসেমশাইয়ের মতোই তিনিও নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া গল্প বলিতেন না। কিন্তু তাঁহার বলার মধ্যে কোথায় যে কি মধু লুকাইয়া ছিল, তাহা এখনও আমি ভাবিয়া বাহির করিতে পারি নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাঁর মনের আনন্দ মিশাইয়া সেই বলার কথাটিতে জীবন পুরিয়া দিতেন। সেই কথাগুলি আমাদের মনে যাইয়া হাসিত, নাচিত, গল্পের দোলায় দোল খাইত। সেই আনন্দপূর্ণ দিনগুলি কখনও ভুলিতে পারিব না! তাঁহার নিকট হইতে আমি 'নাপিত-ব্রাহ্মণ' আর 'জামাই শ্বশুর' গল্প দুইটি শুনিয়াছিলাম।

ফরিদপুর জেলার রাজাপুর স্কুলের একটি ছাত্রের নিকট 'জিদ' গল্পটি আবার শুনি। আমার অন্ধ দাদাজানের গল্পে মোল্লা সাহেবের আখ্যান ছিল না। গল্পের শেষে মোল্লা সাহেব তাঁর ঘোড়ার খুঁটা লইয়া যে হাসির খোরাক জুগাইয়াছেন, তাহা এই ছাত্রটির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

আরও নানা গ্রাম হইতে অপরাপর গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া, আমার সাধ্যে যতদূর কুলায় ছোটদের মনের মতো করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এমনি আরও শত শত গল্প আমাদের গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া আছে। তোমরা সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আমার মতো বই লিখিতে চেষ্টা করিও।

এই গল্পগুলি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙালির ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছে, ফিরিয়াছে ; কত দুঃখের সংসারে আনন্দের হাসি ফুটাইয়াছে।

ক্ষেতে ধান নিড়াইতে, পাট নিড়াইতে, এই গল্পগুলি মেহনতি চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া তাহাদিগকে পরিশ্রমের কথা ভুলাইয়াছে ; মাথার উপরে চৈত্রের গরম রোদ, আর আষাঢ়ের বৃষ্টি-বাদলের কথা ভুলাইয়াছে।

এ গল্প শুনিয়া যেমন আমোদ লাগে, বলিয়াও তেমনি আমোদ

লাগে। কত বিবাহের মজলিসে, বন্ধুজনের আড্ডায়, স্টিমারে, নৌকায় কতভাবেই এই গল্পগুলি মানুষকে খুশি করিয়াছে। কত পীর, মৌলানা, গুরু শিষ্যবাড়িতে যাইয়া এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের মনে আনন্দ দিয়াছে।

শুধু কি আমাদের দেশে ? এই গল্পগুলির কয়েকটা ইউরোপ, আমেরিকা নানা দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছে। চেক দেশের ডাঃ দুশান জুবাভিতল আমার গল্পগুলি পড়িয়া বলিলেন, "তোমার 'কে বড়' গল্পটি অন্যভাবে সোভিয়েত দেশের আবখাসদের মধ্যে পাওয়া যায়। 'তিন মুসাফির' গল্পটি চেকস্লোভাকিয়ায় বেদেদের মধ্যে পাওয়া যায়।" 'আয়না' গল্পটি চেক দেশে একটু অন্য ধরনে প্রচলিত আছে। 'সেরটা কত বড়' গল্পটি গুজরাটে পাওয়া যায়। সোভিয়েত দেশের কয়েকটি গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। তার মধ্যে অচ্ছুৎ গল্পটি একটু অন্য ধরনে আছে। পড়িয়া আশ্চর্য হইলাম।

বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের বঙ্গ-ভারত হইতে গল্পগুলি প্রথমে অন্যান্য দেশে যায়। খ্রিস্টের জন্মের চার শত বৎসর আগে গ্রীক দেশ হইতে আলেকজান্ডার বঙ্গ-ভারতে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ঈশপের গল্পগুলি আমাদের দেশে আসে। তারও আগে আমাদের দেশের গল্পগুলি ইউরোপে যায়।

বেনফি নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, খ্রিস্টের জন্মের এক হাজার বৎসরের মধ্যে কিছু গল্প ইউরোপে যায়। তারপর মুসলমানেরা বঙ্গ-ভারতের বাদশা হইলেন। তাঁহারা এদেশের বহু গল্প আরবি ফারসিতে অনুবাদ করিয়া ইতালি, স্পেন, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া দিলেন।

কনৌজের রাজা শঙ্খল ৪২০ খ্রিস্টাব্দে দশ হাজার লোর জাতীয় বেদে বেদেনিকে পারস্যের রাজা বাহরামের কাছে উপহার পাঠাইয়া দেন। এই বেদের দল নাচিতে গাহিতে পটু ছিল। ইহারা মধ্য এশিয়ার নানা দেশ ঘুরিয়া ইউরোপে প্রবেশ করে। এদেশের শেষ বেদে দল ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরিতে

যাইয়া বসবাস করে। এদের দ্বারাও বঙ্গ-ভারতের অনেক গল্প ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল বঙ্গ-ভারতের পাটনায়। তাঁর ধর্মের সঙ্গে এদেশের গল্পগুলিও তিব্বত, চীন ও জাপানে ছড়াইয়া পড়ে। এইসব দেশের লোকেরা অধিকাংশই মঙ্গোলজাতি। তাহারাও বঙ্গ-ভারতের গল্প-গাথা ইউরোপে লইয়া গিয়া প্রচার করে।

বল ত, এসব ভাবিলে খুব আশ্চর্য হইতে হয় না ? একজন খুব বড় বিদ্বান লোক বলিয়াছেন, পৃথিবীর সব রকমের গল্পের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল এই বঙ্গ-ভারতে। আরও একজন ইউরোপের বিদ্বান লোক বলিয়াছেন, এদেশের গল্পগুলি ইউরোপে যাওয়ায় মধ্যযুগের ইউরোপের সাহিত্যের উপর তারা বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বল ত এসব ভাবিলে কার না গৌরব বোধ হয় ?

আমাদের দেশের সব গল্প এখনও সংগ্রহ করা হয় নাই। তোমরা সেগুলি লিখিয়া বই করিয়া যদি ছাপাও, দেশের ছেলেমেয়েরা পড়িয়া আনন্দ পাইবে। বিদেশের বিদ্বান লোকেরাও তাহার ভিতর হইতে অনেক নতুন নতুন কথা বাহির করিবেন।

'বাঙালির হাসির গল্পে' সাতাশটি গল্প প্রকাশ করিলাম। আরও গল্প আছে, তাহা ধীরে ধীরে প্রকাশ করিব।

এই গল্পগুলির মধ্যে শেয়াল, সিংহ, বামুন, তাঁতি, নাপিত আরও কত লোক আসিয়া ভিড় করিয়াছে। ইহারা কোথাও নীতিকথা বলিয়া, কোথাও লোক-চরিত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তোমাদের আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সবগুলি গল্পের উদ্দেশ্যই শ্রোতাদিগকে হাসানো।

'জিদ' আর 'অচ্ছুৎ' গল্প দুইটি যদিও তোমাদের মনে কিছুটা আনন্দ আনিয়া দিবে, কিন্তু এর পিছনে গরিব তাঁতির জীবনের আর জাতে ওঠার জন্য কাকের যে কান্না জমা হইয়াছে, তা যেন তোমরা বুঝিতে পার।

এই গল্পগুলি লোকের মুখে শুনিয়া লেখা। গল্প বলিবার সময় যে নানারকমের অঙ্গভঙ্গি ও অভিনয় থাকে তাহা আমার লেখায় ভালভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই, কিন্তু গ্রামদেশের লোকেরা যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে গল্পগুলি বলে, তাহা আমার লেখায় ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছি। এর কোনো গল্প যদি তোমাদের ভাল না লাগে, তবে গল্পটির দোষ দিও না ; আমার লেখার দোষ দিও। আমি হয়তো তেমন করিয়া গল্পটি লিখিতে পারি নাই। অথবা যাঁহার নিকট হইতে গল্পটি লইয়াছি, তিনি হয়তো এর আসল মজার স্থানটি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই গল্পগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। তোমার বাবা, তার বাবা, তার বাবা, এরূপ করিয়া বহু পুরুষ ঘুরিয়া বহু বছর পার হইয়া এগুলি আমাদের কাছে আসিয়াছে।

যদিও গল্পগুলি ছোটদের হাতেই আজ তুলিয়া দিলাম, কিন্তু বড়দের হাতেও এগুলি সমান বিকাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ গ্রামদেশে এই শব্দগুলি ছোটরা বড়রা সমানে উপভোগ করে।

আমাদের পরিবারের ছোট বড় সকলের বন্ধু মিসেস বারবারা পেইন্টার এই গল্পগুলি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, লন্ডন হইতে তাহা Folk tales of Bangladesh নামে প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী জানুয়ারি মাসেই এই বই ছাপা হইয়া বাহির হইবে। তখন তোমরা ইংরেজির সঙ্গে বাংলা বইটি মিলাইয়া পড়িলে ভাল ইংরেজি শিখিতে পারিবে। চেকস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ দুশান জুবাভিতল এই পুস্তকের ছয়টি গল্প চেক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। আরও কিছু অনুবাদ করিবেন। ইঁহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জসীম উদ্‌দীন
৩১/১১/৬০

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

বাঙালির হাসির গল্প ছাপানো মাত্র দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। প্রতি বছর হাজার হাজার বই বিক্রি হয়। তাই এবার ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করিতে একটি ভাল প্রেসে অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলাম। কাগজের এই দুর্মূল্যের জন্য বইয়ের দামও বাড়াইতে হইল।

এবার বইখানার বহু জায়গায় নূতন করিয়া লিখিলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বইয়ের কোনো কোনো কথা বদলাইলাম। আমার সোনামণি ছোটরা পড়িবে ত! তাদের হাতে দিতে গেলে লেখাগুলি কি যা-তা করিয়া প্রকাশ করা যায়? পূর্বের মতো এবারও বইয়ের প্রথম দুইটি গল্প যুক্তবর্ণ বাদ দিয়া লেখা হইল। ইহাতে অতি ছোটরাও গল্প দুইটি পড়িতে পারিবে।

এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইয়া কয়েকটি সংস্করণ ইতি- মধ্যেই শেষ হইয়াছে।

চেক দেশের একটি মেয়ে বইখানা চেকভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা আগামী বৎসর ছাপা হইয়া বাহির হইবে। এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদও কয়েকবার ছাপা হইল। এর জন্য যাহা কিছু প্রশংসা আমার বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রাপ্য। তাঁহারাই ত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই গল্পগুলিকে কত রকম বুনটকার্য করিয়া আমাদের হাতে আনিয়াছেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভূক্তি নং
67234
প্রাপ্তি-১৯৯৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

"আপনারা বই কিনলে আরও কী হবে জানেন? দেশের লেখকরা বই বিক্রি থেকে পয়সা পাবেন। দেশে একদল স্বাধীন-মত লেখক তৈরি হবে। তখন তাঁরা যা ভাববেন তাই লিখতে পারবেন। দুর্বলের হয়ে, নিপীড়িতের হয়ে লড়াই করতে পারবেন। আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আদর্শবাদের তাঁরা রূপ দিতে পারবেন। দেশের অধিকাংশ লেখককে যদি জীবিকার জন্য সরকারের কোনো চাকরি করতে হয়, তবে সেই সরকার কোনো অবিচার করলেও লেখক দাঁড়াতে পারেন না। লেখক স্বাবলম্বী হলে সে তো আপনারই লাভ। সরকারের সমালোচনা করে আপনাকে তবে জেলে যেতে হবে না। লেখকের বইগুলি সেই কাজ করবে। রুশো, ভল্টেয়ারের লেখাগুলি তাঁদের দেশে মহাপরিবর্তন এনেছিল।"

জসীম উদ্‌দীন